দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে
দাওয়াতের নিয়তে
পয়গামের প্রকাশ...

ষান্মাসিক

ফারুক্বী পয়গাম

Faruqi Poygam

৩য় সংখ্যা। জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি। মে ২০২৪ ইংরেজি

জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ

JAMIA FARUQIA TAJPUR NABIGANJ HABIGANJ

প্রতিষ্ঠাতাঃ শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী

দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে
দাওয়াতের নিয়তে
পয়গামের প্রকাশ...

ষান্মাসিক

ফারুক্বী পয়গাম

Faruqi Poygam

৩য় সংখ্যা । জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি । মে ২০২৪ ইংরেজি

জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ

JAMIA FARUQIA TAJPUR NABIGANJ HABIGANJ

প্রতিষ্ঠাতা: শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী

জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা

কাজীগঞ্জ বাজার, ৭নং খরগাঁও, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ

ভূমিকা

ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ন জীবন ব্যবস্থা আর কোরআন হচ্ছে এই জীবন ব্যবস্থার সংবিধান, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়ে মহান আল্লাহপাক এই কোরআন শরীফ নাযিল করেছেন, তারপ্রিয়, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের উপর মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর"কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আজ ইসলামের পরিপূর্ণ ও প্রকৃত রুপের অনুশীলন ও বাস্তবায়ন আমাদের মধ্যে তেমন দেখা যাচ্ছে না। এ সকল লক্ষ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে এবং পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসাবে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তোলারঅভিপ্রায়ে আমাদের তাজপুর (মাধুবপুর) এলাকায় একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাই বিবেকের তাড়নার ফসল এই জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা।

"কবুল করহে মোদের এই জামেয়া ওগো দয়াময়
সাহায্য ভিক্ষাচাহি-প্রভূ তোমার, সব সময়"।

আকুল আবেদন

আসসালামু আলাইকুম

বেরাদারানে মিল্লাত,

আল্লাহর অশেষ দয়া ও ফজলে জামেরা ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা ২০০৪ ইংরেজিতে প্রতিষ্টালাভ করে। আজ পযর্ন্ত দ্বীনদার মুসলিম ভাই-বোনদের আর্থিক সহযোগিতায় ও দোয়ায় ইলমে, দ্বীনি প্রতিষ্টানটি পরিচালিত হয়ে আসছে। সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারনের প্রতি আকুল আবেদন এই যে, আপনাদের লিল্লাহ যাকাত, ফিতরা, কুরবানির পশুর চামড়া বা টাকা ও অন্যান্য দান-সদকা থেকে একটি অংশ অত্র প্রতিষ্ঠানে দানকরে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে দান করার তৌফিক দান করুন। আমিন!

শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী

Appeal

Finally, I humbly appeal to all of my muslim brother and sister of all walks of life to generously donate for this good cause. It is my hope that jamia will transform into an Institute of knowledge and practice inshaAllah .

please kindly donate a portion of your lillah,Zakat ,Sadaqah and Fitra to the madrasah for the welfare of this World and the Hereafter.

Sheikh Abu Taher Faruqi

Founder and Principul

ব্যাংক একাউন্ট	**Bank Account**
হিসাবনং- ৪২৮৬৭	Ac: no:- 42867
[পূবালীব্যাংক, নবীগঞ্জশাখা]	[Pubali Bank, Nabiganj Branch]
বিকাশ ০১৭২৬০২২৭৭৮ (পার্সনাল)	B-kash: 01726022778 (Personal)

Facebook: jamia faruqia madrasha | Youtube: Faruqi Dawa Channel

E-mail : **Jamiafaruqia**@hotmail.com | **mataherfaruqi**@hotmail.com

মাসিক ফারুক্বী পয়গাম

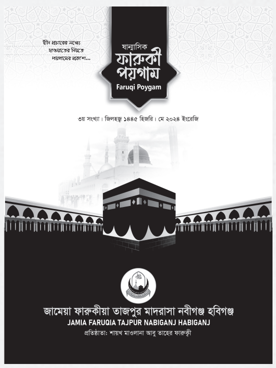

পৃষ্ঠপোষক
আল্লামা মুখলিছুর রহমান কিয়ামপুরী
আল্লামা সাইদুর রহমান বর্ণভী
আল্লামা আব্দুশ শহিদ চাম্পারকান্দী

উপদেষ্ঠা মন্ডলী
শায়খুল হাদিস মাও. রুহুল আমীন
মুফতি সাইফুল ইসলাম, ইউ. কে.
মাও. শামসুদ্দিন, ইউ.কে
হাফেজ মাওঃ মাসরুরুল হক, হবিগঞ্জী
মুফতি মাওঃ হাসান নুরী, ইউকে

প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক
শায়খ মাওঃ আবু তাহের ফারুক্বী

নির্বাহী সম্পাদক
হা. মাও. মোসতাক আহমদ ফারুক্বী

সহ. সম্পাদক
মাও. হোসেন আহমদ ফারুক্বী
হাফিজ জুবের আহমদ ফারুক্বী

প্রকাশনা সম্পাদক
মাও. মোজ্জাম্মিল হক

বানান ভাষারীতি
মাষ্টার ইউনুছ মিয়া

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
মাও. নুরুল হক

সৌদি আরব প্রতিনিধি
মাওঃ নাজমুল ইসলাম সাদিক

প্রচ্ছদ: ইনাম বিন সিদ্দিক
ইলাস্ট্রেশন: আব্দুল মুমিন
গ্রাফিক্স-প্রিন্টিং
কাতিব মিডিয়া, সিলেট
০১৭১৯২৩৭৭২০

প্রকাশকাল
জিলক্বদ ১৪৪৫। মে ২০২৪

সৌজন্যে: মাওলানা নুরুল হক [ইউকে]

সূচী

সম্পাদকীয়	০৩
শায়খ মাওঃ আবু তাহের ফারুক্বী এর বাণী	০৪
দারসে কোরআন	০৫
দারসে হাদিস	০৭
মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সময়ের অপরিহার্য দাবী	০৯
হজ্বের মাহাত্ম	১১
দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৩
ইতিহাসের পাতায় ফিলিস্তিন	১৫
কান্ডারী দৃঢ় হাতে হাল ধরো এ জাতির	১৯
ফারুক্বী পয়গাম	২১
কাবা শরীফ কিভাবে তৈয়ার করলেন	২২
ফিরে দেখা জামেয়া ফারুক্বীয়া	২৪
সু-শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড	২৬
হিংসা একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি	২৭
হযরত যুননুন মিছরীর রঃ মুল্যবান ৮টি উপদেশ	২৯
ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার	৩১
তালিবে ইলমদের প্রতি অমূল্য উপদেশ	৩৩
দোয়ার ফজিলত	৩৪
দুনিয়া পরীক্ষার হল	৩৬
কোরআনের পরিচয়	৩৮
সন্তানদের জন্য পিতামাতার করণীয়	৩৯
উস্তাদের মানসিক বিশ্রামের জন্য ৬টি পদ্ধতি	৪১
ইলম শিক্ষা	৪৩
সময়ের গুরুত্ব	৪৩
এসো সুন্নতকে আকড়েঁ ধরি	৪৪
ঈদুল আযহার তাৎপর্য ও সুন্নাত	৪৫
মুসলমানদের সন্তান আপনাদের নিকট আমানত	৪৬
ফজরের সালাতের ১০টি ফজিলত	৪৭
জরুরী মাসআলা	৪৮
কবিতা	৫০
কুড়ানো মানিক	৫১
জামেয়ার ইতিহাস বৃত্তান্ত	৫২
মুহতামিমে জামেয়ার জীবন বৃত্তান্ত	৫৩
জামেয়ার বৈশিষ্ট	৫৪
এক নজরে জামেয়া	৫৪
যে সমস্ত মনিষীদের পদচারণায় জামেয়া ধন্য	৫৫
২০২৩-২০২৪ সনের ফারেগিন ছাত্রদের নাম	৫৬

সম্পাদকীয়

এক. ফারুক্বী পয়গাম প্রকাশনার সূচনা লগ্নে সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার, - যার অফুরন্ত নিয়ামতের পরশে সৃষ্টি জগত বিমোহিত, অগণিত সালাম ও সালাত, পথহারা মানুষের পথের দিশারী নবীদের সরদার আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর উপর।

দুই. মুসলিম জাতি আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত। একদিকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা ঐক্যবদ্ধভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে তথা কথিত মানবধিকারের দোহাইদারী প্রবক্তাদের নির্যাতনে মুসলিম জাতি আজ নিস্পেষিত। অপরদিকে প্রচারনার মাধ্যমে তারা প্রভাব বিস্তার করে মুসলমানদেরকে শীর্ষ সন্ত্রাসী অপবাদ দিয়ে বিশ্বব্যাপী অসহায় জাতিতে পরিণত করার জন্য অপপ্রচার অব্যাহত রাখছে । জাতির এ দূর্যোগ মুহুর্তে মুসলিম জাতিকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় উন্নতি সাধন এবং ইসলামি ভাব ধারার মিডিয়াকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন । আর এ মহৎ লক্ষকে সামনে রেখেই দেশের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের সুপরামর্শে ২০০৪ সালের ১৯ জানুয়ারী আমার জন্মস্থান নবীগঞ্জের (ইনাতগঞ্জ ও নবীগঞ্জের মধ্যখানে) তাজপুর গ্রামে জামেয়া ফারুক্বীয়া নামে একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। এ যাবত মাদরাসা থেকে অনেক হাফেজে কুরআন ও যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী ছাত্র বের হয়েছে এবং হচ্ছে । আধুনিক সিলেবাসের সমন্বয়ে পরিচালিত এবং মানসম্মত লেখা পড়াও ভাল ফলাফল অর্জনের কারণে মাদরাসার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি আদর্শকে অনুসরণ করেই পরিচালিত হচ্ছে। আর এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, ক্বওমী মাদ্রাসা সমূহ শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই মূখ্য নয়। বরং শিক্ষার পাশাপাশি তাবলীগ তথা দ্বীনি দাওয়াতের কাজে আঞ্জাম দেয়া, ছিয়াছত তথা রাজনৈতিকভাবে শক্তি অর্জন , জিহাদ তথা দেশ জাতির দাবী আদায়ের আন্দোলন সহ সর্বক্ষেত্রে যোগ্য আদর্শ মানব গঠনই হলো ক্বওমী মাদ্রাসার মূখ্য উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায় প্রায় দেড়শত বছরের ইতিহাস অসংখ্য অগণিত আলেম উলামা, মোহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, পীর বুজুর্গের মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জেন ও সমাজসেবক রাজনীতিবিদ লেখক সাংবাদিক সম্পাদক ক্বওমী মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। মাদ্রাসার শিক্ষার এ ঐতিহ্যবাহী অবদানকে সামনে রেখেই আমার প্রতিষ্ঠান জামেয়া ফারুক্বীয়াকে এগিয়ে নিতে চাই । জানি সফলতা আসতে অনেক বাঁধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে। তবু চাই আমার শ্রম সাধনার ফলে মাদ্রাসা থেকে একঝাঁক তরুন দেশ ও জাতিকে উপহার দিতে। যারা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের সাথে সাথে খালিছ দ্বীন ও ইসলামের কল্যাণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে। আর এ প্রত্যাশার আলোকেই আমার মাদ্রাসার ছাত্রদের শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি ছাত্র যাতে মাতৃভাষা বাংলায় পান্ডিত্য অর্জন করে সত্যিকার একজন লেখক, সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে । যাদের লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠবে ইসলামের সোনালী ইতিহাস। এ মহান লক্ষ্যেই সাহিত্য চর্চার এক পাঠশালা হিসাবে তুলে দিয়েছি প্রাথমিক পর্যায়ে ষান্মাসিক ফারুক্বী পয়গাম । যা পরবর্তীতে মাসিক ম্যাগাজিন হিসাবে প্রকাশের চিন্তাধারা রয়েছে। তবে ফারুক্বী পয়গামের যাত্রার পথে আমার একান্ত বিশ্বাস, ইসলামের প্রচার প্রসারে এবং মিডিয়া জগতে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ লেখা প্রকাশে এগিয়ে গেলে স্বাপ্নিক সফলতা বাস্তবিক রূপ নিবে। এতে প্রয়োজন পাঠক সমাজে সুপরামর্শ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা। যাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণাই হবে ফারুকী পয়গামের আগামী দিনের পথচলা ।

শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী এর বাণী

حامدا و مصليا و مسلما، أما بعد

হক বাতিলের সংঘাত চিরকালের। সত্য, সুন্দর ও কল্যানের অগ্রযাত্রায় বাতিল পন্থিদের প্রতিবন্ধকতা এবং হক পন্থিদের প্রাণান্ত মুজাহাদা নিয়েই রচিত দুনিয়ার ইতিহাস। মুসলিম জাতির গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ও দ্বীনি শিক্ষার দাওয়াত জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার দু'টি মাধ্যম রয়েছে। এক. মৌখিকভাবে দুই. কলম ও লেখনীর মাধ্যমে। একজন মানুষ তার ভাবাবেগ তথা মতবাদকে লেখনীর মাধ্যমে জাতির কাছে পৌঁছে দিতে যতটুকু সক্ষম হয়, অন্যকোনো মাধ্যমে ততটুকু সক্ষম হয় না। লেখনীর মাধ্যমেই ইমাম বুখারী, মুসলিম, গাজালী, রাযী, থানভীসহ (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমূখ মহা মনীষীবৃন্দ মরেও অমর হয়ে রয়েছেন। তাই মৌখিক দাওয়াতের পাশাপাশি কলমী দাওয়াতেও অগ্রগামী থাকা অপরিহার্য ।

ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও জামিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জামিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিতব্য এ স্মারক গ্রন্থটি নিশ্চয়ই সময়োপযোগী একটি মহতী প্রচেষ্টা। দু'আ করি, আল্লাহ পাক যেন এ মহতী কাজে অংশগ্রহণকারী এবং জামিয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি ত্যাগী, সহযোগী সকলকে জাযায়ে খায়র দান করেন, এবং জামিয়ার উস্তাদবৃন্দ ও তালাবাদেরকে কোরআন ও সুন্নাহের ধারক ও বাহক হিসাবে কবুল করে নেন । এবং জামিয়াকে তার সঠিক লক্ষ্যপানে পৌঁছিয়েদেন। আমীন!

দারসে কোরআন

[সুরা ফাতিহার সংক্ষিপ্ত তাফসীর]

মারিফুল কুরআন,

[মুফতি শফি সাহেব রহ. এর গ্রস্থ থেকে]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তরজমা

১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২)যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। ৬) সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছো। ৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

ফজিলত ও বৈশিষ্ট্যঃ

সুরা ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুরা। প্রথমে এ সুরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন শুরু হয়েছে এবং এ সুরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সুরা রুপে এ সুরাই প্রথম নাজিল হয়েছে। সুরা ফাতিহায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সুরা গুলো প্রকারান্তরে সুরা ফাতিহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ সমগ্র কোরআন প্রধানত ঈমান ও নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দুটি মূলনীতি এ সুরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাই এ সুরাকে সহিহ হাদিসে উম্মুল কোরআন, উম্মুল কিতাব, কোরআনের আজীম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করবে, তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল মুসতাক্বীমের হেদায়াত দান করেন। রাসুল (স.) এরশাদ করেছেন যে- 'যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তার শপথ করে বলছি, সুরা ফাতিহার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো আসমানী কিতাবে নেই। এমনকি কোরআনেও এর দ্বিতীয়টি নেই।'

ইমাম তিরমিযি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নণা করেন যে, 'সুরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধ বিশেষ।'

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -উক্ত আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর (সংগৃহীত মারিফুল কোরআন)।

এটি একটি ব্যপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানব সমাজের কোনো ব্যক্তিই এর আওতার বাহিরে নেই। কেননা সরল সঠিক পথ ব্যাতীত দ্বীন ও দুনিয়ার কোনোটিরই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার বিবর্তমানের মাঝে ও সিরাতে মুসতাক্বীমের প্রার্থনা পরশপাথরের ন্যায়।

কিন্তু মানুষ তা বুঝে না ও লক্ষ্য করে না।
আয়াতের অর্থ- 'আমাদেরকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।।' সরল পথ কোনটি- সোজা সরল রাস্তা সে পথকে বলে। যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাচ নাই। ধর্মের সে রাস্তা যাতে ইফরাত বা তাফরীত এর অবকাশ নেই। (সীমালঙ্ঘন বা মনমত কাটছাট করে নেওয়া।)
এরপরের আয়াতে আল্লাহ তায়লা বলেন-
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
অর্থ- যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের রাস্তা। কারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি?
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়লা বলেন- যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তারা হলেন- নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং সৎ কর্মশীল সালেহীনগণ। আল্লাহর দরবারে মকবুল লোকদের মাঝে সর্বোচ্চ স্তর হলো নবীগণ অতঃপর ধারাবাহিক ভাবে অন্যান্যরা। সিরাতে মুসতাক্বীমের হেদায়েতেই দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের একমাত্র চাবিকাটি। আল্লাহ তায়ালা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন তা হচ্ছে সিরাতে মুসতাক্বীমের হেদায়েত প্রাপ্তির দোয়া। এমনিভাবে আখেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল পথ রয়েছে, যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। অনুরুপ ভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও সিরাতুল মুসতাক্বীম বা সরল পথের মধ্যেই নিহিত। যে সকল পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে। যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোনো ভূল হয়েছে।
সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দ্বীনই জীবনের সাফল্যের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতা ও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্য প্রত্যেক মুমিনের এ দোয়া তাসবীহ স্বরুপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে হবে, শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

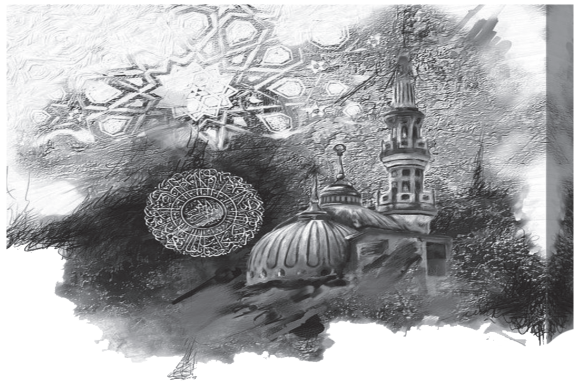

দারসে হাদিস

রাসুল সা. এর প্রতি ভালবাসা

শায়খুল হাদিস মাওলানা রুহুল আমিন
মুঈনে মুহতামিম, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

নবী ভক্তির উপর ঈমান নির্ভরশীল।
* হযরত আনাস (রা:) এর বর্ণনা, নবী করীম (সা:) এরশাদ করেছেন-
তোমাদের কেউ সে পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান এবং দুনিয়ার অন্য সকল মানুষের চাইতে বেশি প্রিয় না হই। (বোখারী-মুসলিম)
* আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা:) এর বর্ণনা করেন-
আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে ছিলাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব এর হাত তার পবিত্র হাতে ধরা ছিল । ওমর রা: বলতে ছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ । নিজের প্রাণটুকু ছাড়া দুনিয়ার সবকিছু থেকেই আপনি আমার নিকট বেশী প্রিয় একথা শুনে হযরত নবী করীম (সা:) এরশাদ করলেন, না ওমর তাতে হবে না । সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে পর্যন্ত নিজের প্রাণের চেয়েও আমাকে বেশী প্রিয় মনে না করবে সে পর্যন্ত ঈমানের পূর্ণতা আসবে না। একটু চুপ থাকার পর হযরত ওমর (রা:) আবার বললেন, হাঁ এখন একটু অনুভব করছি আপনি আমার প্রাণের চেয়ে বেশী প্রিয় । একথা শুনে হুজুর (সাঃ) এরশাদ করলেন এতক্ষনে হলো হে ওমর । রাসুল (সা:) এর আনুগত্য
হযরত আবু হোরায়রা (রা:) এর বর্ণনা- হযরত নবী করীম (সা:) এরশাদ করেছেন -
যে ব্যক্তি আমার অনুস্মরণ করল প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহরই অনুস্মরণ করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়লার নাফরমানী করল। (বোখারী)
* আবু হুরায়রা (রা:) এর বর্ণনা রাসুল (সা:) এরশাদ করেন-আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে, শুধু মাত্র ঐসব লোক ব্যতীত যারা অবাধ্যতা দেখিয়েছে। সাহাবারা আরজ করলেন ইয়া রাসুল (সাঃ) সেটা কোন ধরণের অবাধ্যতা? রাসুল (সা:) বললেন- যে ব্যক্তি আমার অনুস্মরণ করবে সে জান্নাতি হবে । আর যে অবাধ্যতা দেখাবে সে জাহান্নামী হবে। (বোখারী)
* হযরত আবু হোরায়রার (রা:) বর্ণনা- হযরত নবী করীম (সা:) এরশাদ করেছেন-
আমি তোমাদের যেসব আদেশ করি সেসব আদেশ তোমরা সাধ্যমত পালন করতে চেষ্টা কর।

যেসব বিষয় বারণ করি সেগুলি থেকে বিরত থাক। (বোখারী)

সাহাবীগণের রাসুল প্রীতির নমুনা -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণনা- বদর প্রান্তরে শত্রুসেনার মুখোমুখি হওয়ার পর সাহাবী হযরত মেকদাদ (রাঃ) হযরত নবী করীম (সা:) এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখলেন, প্রিয় নবী (সাঃ) গভীর মনোযোগের সহিত আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন। দোয়া সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত মেকদাদ (রা:) আরজ করলেন, ইয়া রাসুল (সা:) আমরা কখনো সে কথা বলব না, শত্রুর সামনা সামনি হয়ে বনী ইসরাঈলরা হযরত মুসা (আঃ) কে যা বলেছিল । অর্থাৎ আপনি এবং আপনার আল্লাহ গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করুন। আমরা এখানে নিরাপদ দুরত্বে বসে সে মোকাবেলার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। বরং অমরা জানবাজি রেখে আপনার ডান বাম, অগ্র পশ্চাতে সবদিকে লড়াইকরে যাব।

বর্ণনাকারী বলেন- মেকদাদ এর সাহসিকতা পূর্ণ বক্তব্য শ্রবণ করার পর প্রিয় নবীজির পবিত্র চেহারায় পরম সন্তুষ্টির আভা দেখতে পেলাম (বোখারী)

সুন্নাহ কুরআনের মতই শরীয়তের দলিল

মেকদাদ ইবনে সাদিক (রা:) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা:) এরশাদ করেন-

আমাকে কিতাব (কোরআন) দেওয়া হয়েছে এবং এরই অনুরূপ সুন্নাহ দেওয়া হয়েছে। উভয়টি তোমাদিগকে সমভাবে মান্য করতে হবে। এমন এক সময় হয়তো আসবে যখন কোন আয়েশি ব্যক্তি তাকিয়া হেলান দিয়ে বলতে শুরু করবে শুধুমাত্র কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এর মধ্যে যা কিছু হালাল করা হয়েছে সেসবকে হালাল মনে করলে আর যেসবকে হারাম করা হয়েছে সেগুলিকে হারাম জানলেই চলবে। এ ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করে বর্তমানে এ ফেতনার অবির্ভাবহয়েছে। (আবু দাউদ)

হযরত আবু রাফে (রা:) বর্ণনা করেন- হযরত নবী করীম (সা:) এরশাদ করছেন-

আমি তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় যেন না পাই যে, সে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছে। তার নিকট আমার কোন নির্দেশ পৌঁছে যাতে আমি কোন কিছু করার অথবা কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছি। তখন বলতে থাকবে এ নির্দেশের সাথে আমরা কোরআনে যা হালাল করা হয়েছে শুধু সে সবকেই হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে সেসবকেই হারাম বলে মান্য করবো। (আবুদাউদ)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন!

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সময়ের অপরিহার্য দাবী

শায়খ মাওঃ আবু তাহের ফারুক্বী

মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে ইসলামী শিক্ষা বুঝায়। আর ইসলামহচ্ছে সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। এ শিক্ষা শুরু হয়েছিল রাসুল (সাঃ) এর মক্কী জীবন থেকে। মক্কা নগরীতে ১৩টি গোপন কেন্দ্রে উপানুষ্ঠানিক বেসরকারি ব্যবস্থা হিসেবে রাসুল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম তাদের বাড়ি ঘরেই এ শিক্ষা চালু করেছিলেন। সে সময়ে যেটুকু কোরআন নাযিল হয়েছিল ততটুকুর শিক্ষা চলত। হিজরতের পর মদীনায় স্বাধীন পরিবেশে মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। এটা ছিল সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম। মৌলিক বিষয় ছিল কোরআন এবং সুন্নাহ। প্রধান শিক্ষক ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। রাসুল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটি বিরাট দলকে মুআল্লিম বা শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন । পরবর্তীতে তারা মোবাল্লিগ বা শিক্ষক হিসেবে বিশ্বময় ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখেন। রাসুল (সাঃ) এরপর খোলাফায়ে রাশিদীন হয়ে উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমল থেকে একেবারে তুর্কি সালতানাতের পতন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে সরকারি ভাবে ইসলামি শিক্ষাই চালু ছিল।

তবে মৌলিক বিষয়কে ঠিক রেখে যুগের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় সংস্কার পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন হয়েছে । সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। উপনিবেশিক আমলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব রাষ্ট্র ওয়াকফ সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। বন্ধ হয়ে যায় ইসালিমক শিক্ষা। চালু করা হয় স্যাকুলার বা ধর্মহীন শিক্ষা। এভাবে আমাদের সামনে আসে সাধারণ শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার নামে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা । তাও বৃটিশ আমল থেকেই আবার দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে আসে। আলিয়া বা সরকারি এবং কওমী বা বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশী বিপর্যয়ের পর অভিবিভক্ত বাংলায় ও ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই যুগে ইংরেজ শাসকগণ সু- কৌশলে এদেশের মাদ্রাসা ও মসজিদ সমূহে বিরাট বিরাট ওয়াকফ এস্টেট সমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেলে। ফলে এর আগে স্বাধীনভাবে পরিচালিত ইসলামি শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটে। শুধু তাই নয় বরং বাজেয়াপ্ত ও রাষ্ট্রায়ত্ত এসব সম্পদ হিন্দু জমিদারদের মধ্যে স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে বৃটিশ শাসন পাকাপোক্ত করার অপকৌশল গ্রহণ করে । এমতাবস্থায় ইসলামি শিক্ষা বহাল রাখার দাবীতে মুসলমানরা তীব্র

আন্দোলন গড়ে তোলে । এরই প্রেক্ষাপটে বৃটিশ তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ খ্রিঃ কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । রাষ্ট্রভাষা ফার্সির স্থলে ইংরেজী চালু করা ও স্যাকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ফলে চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে। ফলে আলেম সমাজ ও রাজ্যহারা মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮৫৭ খ্রিঃ সিপাহি বিদ্রোহের পতন ঘটে ।

সিপাহী বিদ্রোহে মাদ্রাসায়ে আলিয়ার শিক্ষক ও ছাত্রদের অংশগ্রহণের অপরাধে তাদেরও গ্রেফতার করা হয় এবং মাদ্রাসায়ে আলিয়াকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার পায়তারা চলতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করে বাংলা ও আসামে আলিয়া নেসাবের বহু বেসরকারি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন । অপরদিকে এই সংকটময় সময়ে উপমহাদেশে ইসলামের নিভু নিভু প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার তাগিদেই মাদ্রাসায়ে আলীয়া প্রতিষ্ঠার ৮৬ বছর পর ১৮৬৬ খ্রিঃ ভারতে দারুল উলুম দেওবন্দ নামে প্রথম বেসরকারি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাহারানপুরে মাজহারুল উলুম নামে অপর একটি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠত হয়। এ দু'টি প্রধান কওমী বেসরকারি মাদ্রাসায় শিক্ষিত আলেমগণের দ্বারা ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অনেক কওমী মাদ্রাসা গড়ে উঠে। ১৯৪৭ সালে আমরা একবার স্বাধীনতা লাভ করি । কিন্তু স্বাধীন মুসলিম দেশে সার্বজনীন একই ধারার ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি । সাধারণ শিক্ষা আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা এ তিন প্রকারের শিক্ষায় জাতি বিভক্ত হয়ে গড়ে উঠতে থাকলো, এটা বড়ই দুঃখজনক ।

১৯৭১ সালে আমরা আবার স্বাধীন হলাম । কিন্তু বৃটিশ পাক আমলের ত্রয়ী চক্র থেকে জাতি মুক্তি পেল না । স্বাধীন দেশের উপযোগী সার্বজনীন ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। এক্ষেত্রে দায় দায়িত্ব কারো একার নয়। সকল পক্ষের জন্যই করণীয় বিষয় আছে। আলীয়া মাদ্রাসার সিলেবাসেও সংস্কার আনয়ন সময়ের অপরিহার্য দাবী । প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের এই তিনটি পর্যায়ে সিলেবাসকে পুনর্বিন্যাস করা উচিত । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে সেভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

উচ্চশিক্ষাকে কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে যথাক্রমে ডিগ্রি ও এমএ'র মান দেয়া এখানকার গুরুত্বপূর্ণ দাবী। প্রয়োজনে ঢাকা ও সিলেটে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসাকে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যেতে পারে। আলিয়া মাদ্রাসার উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা উচিত । তাছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যোগসূত্র তৈরির লক্ষ্যে সাধারণ বিষয়ে বই পুস্তক যেমন বাংলা, অংক, ইংরেজী, বিজ্ঞান ইত্যাদি একই পুস্তক হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে দেশের সকল শিক্ষার জন্য সমন্বিত পাঠ্যপুস্তকরচনা ও সংকলন করা যেতে পারে।কওমী কর্তৃপক্ষেরও উপযোগী সমাজসংস্থা পরিচালনার উপযোগী দক্ষ জনবল তৈরি করার জন্য উপযুক্ত সিলেবাস প্রয়োজন । প্রয়োজন উন্নত ও আধুনিক পাঠদান পদ্ধতির । প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর। এখানে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব দেয়া উচিত । আধুনিক বিষয়াবলী সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা জরুরী । শিক্ষক নিয়োগ ও মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন । প্রয়োজন সরকারি স্বীকৃতি দানের ।

একই দেশে কয়েক প্রকারের শিক্ষা জাতিকে বিভক্ত করে । বিভক্ত করা শত্রুদের কাজ ছিল । স্বাধীন দেশে একমুখী শিক্ষা প্রয়োজন। প্রয়োজন সার্বজনীন ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও আধুনিকায়নের মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে একধাপ অগ্রগতি হতে পারে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাও সংস্কার প্রয়োজন । নীতি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য সাধারণ শিক্ষারও ইসলামী করণ প্রয়োজন। নতুবা নৈতিকতার পতন ও মানবিক বিপর্যয় রোধ করা যাবে না ।

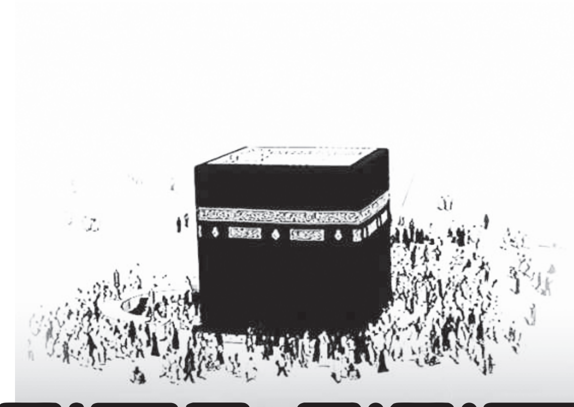

হজ্বের মাহাত্ম

হাফেজ মাওঃ মাসরুরুল হক, হবিগঞ্জী

পবিত্র হজ্ব ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। এটি ইসলামের পঞ্চ ভিতের একটি এবং অকাট্য ফরজ। সম্পদশালী, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাস্থ্যবান ও স্বাধীন মুসলমান নর-নারীর প্রতি জীবনে একবার হজ্ব ফরজ করা হয়েছে। হজ্বের শাব্দিক অর্থ সংকল্প, দৃঢ় ইচ্ছা, পূণ্যভূমি জিয়ারতের বাসনা। ইসলামের পরিভাষায় ইহরামের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কার পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফ আরাফাতে অবস্থান এবং মক্কায় নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান সমূহে হাজির হয়ে আদবের সাথে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করাকে হজ্ব বলে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আ.) সর্বপ্রথম হজ্ব অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। এরপর থেকেই নবী-রাসূল পরম্পরায় চলে আসছে হজ্ব পালনের অনুষ্ঠান। হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত একত্ববাদ ভিত্তিক হজ্ব অনুষ্ঠান কালক্রমে পৌত্তলিকতা, অবৈধ ক্রিয়াকলাপ ও অশালীন অনুষ্ঠানাদিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। বিশ্ব নবী (স.) হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত হজ্বকে পুনঃ চিরন্তন ইসলামের একত্ববাদী আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার ১২৫ নং আয়াতে কাবা ঘর নির্মাণ সম্পর্কিত বিষয়ে এভাবে প্রকাশ করেছেন। "আমি যখন কাবা গৃহকে মানুষের ইবাদতের স্থল এবং নিরাপত্তার স্থান করলাম আর বললাম নামাজের জন্য স্থান নির্বাচন করুন মাকামে ইব্রাহীমকে। আর আমি ইব্রাহীম (আ.) কে এবং ইসমাইল (আ.) কে আদেশ করলাম- গৃহটিকে খুব পবিত্র রেখো বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের জন্য এবং রুকু-সেজদাকারীদের জন্য।"

প্রবর্তনের পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে সঙ্গে নিয়ে কাবা ঘর পুনঃনির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে হযরত আদম (আ.) ফেরেশতাগণের সহায়তায় সর্ব প্রথম খানায়ে কা'বা নির্মাণ করেন। হযরত নূহ (আ.) এর সময়ের মহাপ্লাবনে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর সাহায্যে অবস্থান জেনে নিয়ে একই ভিতে অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত খানায়ে কাবার স্থানে এর পুনঃ নির্মান করেন। নির্মাণ কাজ শেষ হলে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর প্রতি নির্দেশ হলো হজ্বব্রত পালনের। আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর মারফতে তাকে হজ্বের সকল আহকাম সম্পর্কে অবহিত করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) কে সাথে নিয়ে খানায়ে

কাবা সাতবার তাওয়াফ করেন। চুম্বন করেন হাজরে আসওয়াদ এবং একে একে সম্পন্ন করেন হজ্বের সকল আহকাম। এরপর আল্লাহর নির্দেশ এলো, হজ্বের দাওয়াত বিশ্ববাসীকে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

হজ্বের মাহাত্মঃ

পবিত্র হজ্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, “মানুষের উপর বায়তুল্লাহ’র হজ্ব ফরজ করা হয়েছে ইবাদত হিসেবে। যারা যে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ রাখে। আর যারা অস্বীকার করবে, তাদের আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ রাখা উচিৎ। আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন। (সুরা আল ইমরান-৯৭)”

আবার একই বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নবী কারীম (স.) এর ভাষায়- সাহাবী আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করিম (স.) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন- আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি হজ্ব ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্ব পালন করো। (মুসলিম শরীফ)। নবী করীম (স.) আরো বলেন- হজ্ব করার সামর্থ থাকা সত্তেও যে হজ্ব পালন করবেনা সে ব্যক্তি ইয়াহুদি হয়ে মরুক আর খ্রিস্টান হয়ে মরুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। প্রিয় নবী (স.) হজ্বের ফযিলত সম্পর্কে বলেছেন- বিশুদ্ধ ও মকবুল একটা হজ্ব পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম বেহেশত ব্যতীত আর কোন কিছুই তার প্রতিদান হতে পারে না।

হজ্বের শিক্ষাঃ বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টিকারীর বিষয়গুলোর মূলোৎপাটন করে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্টিকে এক সূত্রে বন্ধন করাই হজ্বের মহাসম্মেলনের অন্যতম সুফল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, হজ্বের এই মহান সুফল আধুনিক গণকেন্দ্রিক স্বার্থসর্বস্ব দুনিয়া দুঃখজনক ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ স্বার্থের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছিনা। স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আমরা ধর্মীয় আদর্শ তথা হজ্বের মাহাত্ম ও শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে আজ আমরা হজ্বকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব ইবাদতে পরিণত করি।

তাই যদি না হবে, তবে কেমন করে এক মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান হজ্ব পালন করে এসে আরেক মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করতে পারে? কেমন করে মুসলমানদের চোখের সামনে বেদ্বীন বিজাতিরা শক্তির দাপট প্রর্দশন করে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় হুমকি ধমকি ছাড়তে পারে? কেমন করে মুসলমানরা দেশের মধ্যে অনৈসলামী কর্মকান্ড করতে পারে?

ইসলামের সোনালী যুগে সাহাবায়ে কেরামগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছিলেন বলে বিদায় হজ্বের ময়দান থেকে ফিরে এসে হতে পা গুটিয়ে নিস্ক্রিয় ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তাঁরা সমস্ত সুখ-শান্তি, ভেঙ্গে বিলাস, মায়া-মমতা, পরিবার-পরিজন, ঘর বাড়ি সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া জান-মাল ও সময় আল্লাহর পথে তখন দ্বীনের পথে উৎসর্গ করেছিলেন।

কাজেই আজ আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। তাঁদের মত আমরা যেন হজ্বের শিক্ষাগুলোকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত করে এই সুন্দর পৃথিবীকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে পারি, তারই প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রোঃ মাওলানা আখলাকুর রহমান
মোবাইল ঃ ০১৭৪৫-৯৫৭৭৫৩

উসমান টেইলার্স এন্ড ফেব্রিক্স

এখানে উন্নতমানের পাঞ্জাবী, থান কাপড়, যাবতীয় কাপড় সুলভমূল্যে বিক্রয় করা এবং দক্ষকারীগড় দ্বারা পাঞ্জাবী, পায়জামা, জুব্বা, তুব সেলাই করা হয়।

কাজীগঞ্জ বাজার ফটিক মার্কেটের সামনে, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাফেজ মাও. মোসতাক আহমদ ফারুক্বী [ইউ কে]
নায়েবে মুহতামিম, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। হেরা গুহায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হয় তা হচ্ছে, 'পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে।'-সূরা আলাক : ১-২

আল্লাহ তাআলার আদেশে মানুষ যেমন লাভ করেছে জীবনের আলো তেমনি আল্লাহরই নিকট থেকে সে লাভ করেছে ইলমের নূর। ইলমের মাধ্যমে মানুষ নবজন্ম লাভ করে। আল্লাহর মারিফত যখন মানুষের মধ্যে আসে তখনই সে প্রকৃত মানুষ হয়।

শিক্ষাকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, শিক্ষা মৌলিকভাবে দুই প্রকার : জাগতিক শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষা। মানুষের জাগতিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী জ্ঞান ও বিদ্যা হচ্ছে জাগতিক শিক্ষা। যেমন বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদি। এই শিক্ষার মূল সূত্র অভিজ্ঞতা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির জ্ঞান হচ্ছে দ্বীনি শিক্ষা। এই শিক্ষার মূল সূত্র ওহী।

দ্বীনি শিক্ষা ও তার গুরুত্ব

দুনিয়ার নিয়ম ও ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখার জন্য যেমন জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজন তেমনি দ্বীনের হিফাযতের জন্য এবংদুনিয়ার সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক হওয়ার জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজন। মুসলিম সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ যেন দ্বীন মোতাবেক চলতে পারে এবং হারাম থেকে বেঁচে হালালভাবে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য কুরআন-সুন্নাহয় পারদর্শী একটি জামাআত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, 'কেন বের হয় না প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল, যাতে তারা দ্বীনের তাফাক্কুহ অর্জন করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে তাদের জাতিকে যখন তারা ফিরে আসে তাদের নিকট। সম্ভবত তারা আল্লাহ ভীতি অর্জন করবে।' (সূরা তাওবা : ১২২) এজন্য প্রত্যেক জনপদে দ্বীনের ইলমে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকা ফরযে কিফায়া। আর এই উদ্দেশ্যে দ্বীনের ইলমের চর্চা অব্যাহত রাখা সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন-সুন্নাহর চর্চা ও অনুসরণের অভাব হলে সমাজের সকল অঙ্গনে দুর্নীতি ও অনাচার দেখা দিবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমাজ যতই উন্নতি লাভ করুক ঈমান ও আল্লাহভীতি না থাকলে তা মানুষের ক্ষতি ও অকল্যাণে ব্যবহৃত হবে। মানুষের সকল আবিষ্কারকে অর্থপূর্ণ ও কল্যাণমুখী করার জন্যই অপরিহার্য প্রয়োজন ইলমে ওহীর চর্চা। তদ্রূপ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবিকলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অপরিহার্য। ইসলামের অপব্যাখ্যা ও বিভিন্ন বাতিল মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী চিন্তাধারা পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেওয়াও আলিমদের কর্তব্য। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক প্রজন্মের ন্যায়-নিষ্ঠ লোকেরা দ্বীনের এই ইলমকে ধারণ করবে। তারা সীমালংঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিল পন্থীদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে একে রক্ষা করবে।'-(সুনানে বায়হাকী ১০/২০৯)

দ্বীনি শিক্ষার ফযীলত

এ শিক্ষার বিষয়বস্তু যেহেতু সরাসরি দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত তাই এর ফযীলতও অন্যান্য শিক্ষার তুলনায় বেশি। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হল :-

১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন বহুগুণ।' সূরা মুজাদালা : ১১

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।'-সহীহ বুখারী ২/৭৫২

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ আসান করে দেন।'-সহীহ মুসলিম ২/৩৪৫

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করে দিন, যে আমার কোনো হাদীস শুনেছে। অতঃপর অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।'-সুনানে আবু দাউদ ২/৫১৫

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ' আল্লাহ তাআলা যাকে প্রভূত কল্যাণ দিতে চান তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।' - সহীহ বুখারী ১/১৬

৬. অন্য হাদীসে আছে, 'আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিস।'-তিরমিযী ২/৯৭

৭. আরেক হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, 'যে ইলম অনুসন্ধানে বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।'-জামে তিরমিযী ২/৯৩

তবে দ্বীনি ইলমের উপরোক্ত ফযীলত লাভের জন্য শর্ত হল : ইখলাছ। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই ইলম অর্জন করতে হবে। পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে তা অর্জন করা যাবে না। পার্থিব সুনাম-সুখ্যাতির উদ্দেশ্যে দ্বীনী ইলম অর্জন করা হলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীস শরীফে এসেছে যে, জাহান্নামে সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত তিন ব্যক্তির একজন হবে ঐ আলিম, যে লোকের কাছে আলিম হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার জন্য ইলম চর্চা করেছে। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এমন ইলম শিখল, যা শুধু আল্লাহর জন্যই শেখা হয় সে কিয়াতমতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।- সুনানে আবু দাউদ ২/৫১৫

মোটকথা, ইসলামে দ্বীনি শিক্ষার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি জাগতিক শিক্ষারও গুরত্ব রয়েছে। পার্থিব প্রয়োজন পূরণ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য জাগতিক শিক্ষা অতীব জরুরি। উপরন্তু বহু দ্বীনি কাজের জন্যও জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে।

পক্ষান্তরে জীবনের সকল কাজ ইসলামের বিধান মোতাবেক করার জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই। দ্বীনি ইলমের চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমেই সমাজে ঈমান-আমল, আল্লাহ ভীতি ও আখিরাত-মুখিতা সৃষ্টি হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া যেমন আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতের কামিয়াবী অর্জন করা যায় না তেমনি দুনিয়ার জীবনও দুর্নীতি, অনাচার, জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্ত করা যায় না। এজন্য আখিরাতে কামিয়াবী ও দুনিয়ায় শান্তি নিরাপত্তার জন্য দ্বীনি ইলমের চর্চা অপরিহার্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক মানুষের মেধা, আয়ু ও সামর্থ্য সীমিত, সকল বিষয় একই ব্যক্তি শিখে ফেলবে এটা সম্ভব নয়। অতীতেও এরকম হয়নি। বর্তমানেও হয় না। সমাজে যে ডাক্তার হয় সে একই সাথে অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিক, আইনবিদ, কৃষিবিদ, দার্শনিক সবকিছু হয় না। হতে পারেও না। তাই ইসলামের দিকনির্দেশনাও হচ্ছে প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সমাজের কিছু কিছু লোক পারদর্শী হবে। প্রত্যেকে তার স্ব স্ব শিক্ষার মাধ্যমে অন্যকে সাহায্য করবে। এভাবে পুরো সমাজ একটি ইউনিটের ন্যায় হবে। পেশা ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র সত্ত্বেও যে বিষয়টি সবাইকে মিলবন্ধনে আবদ্ধ রাখবে তা হচ্ছে ঈমান ও ইসলাম। কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও সবার বিশ্বাস ও আদর্শ হবে অভিন্ন এবং এই আদর্শিক অভিন্নতার ভিত্তিতেই সকল মুসলিম হবে ভাই ভাই। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার রূপরেখা এটাই। মুসলিম জাতি যখন বিজয়ীর আসনে ছিল তখন তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা এমনই ছিল। মুসলমান যদি তাদের গৌরবময় অতীত ফিরে পেতে চায় তাহলে তাদেরকে এ পন্থাই অনুসরণ করতে হবে।

ইতিহাসের পাতায় ফিলিস্তিন

মাওলানা জুনাইদ আহমদ
মুহাদ্দিস, জামেয়া মাহমুদিয়া হামিদনগর, বাহুবল

ইফতেতাহ

সম্মানিত পাঠক! আমরা এখানে ফিলিস্তিনের বিস্তারিত ইতিহাস উল্লেখ করার হিম্মত রাখিনা। এতো ১০ হাজার বছরের ইতিহাস। একটি প্রতিষ্ঠিত জাতিকে নির্মমভাবে নিঃচিহ্ন করার মর্মান্তিক ইতিহাস। সংক্ষেপে ইসলামপূর্ব ও ইসলাম পরবর্তী ফিলিস্তিন, দখলদার ইসরাঈল ও যায়নাবাদীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখের প্রয়াস এটি।

ইবরাহিম আ: ফিলিস্তিনে

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ:) যদিও ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন তবে আল্লাহর নির্দেশে খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ সালে ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। বসবাস করেন নাবলুশ অঞ্চলে। ফিলিস্তিনে তখন শাসন চলতো হিকসোসদের। ইব্রাহিম আ: এর ২য় স্ত্রী হযরত হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইসহাক (আ:)। এবং ১ম স্ত্রী সারা এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইসমাঈল (আ:)। আল্লাহর নির্দেশে তিনি হাজেরা ও সন্তান ইসমাঈল (আ.) কে রেখে আসেন মক্কা মুকাররামায় এবং সারা ও ইসহাক আ: কে নিয়ে ফিলিস্তিনেই বসবাস করতে থাকেন। যেহেতু হিকসোসরা ধর্ম প্রচারে কোনরূপ বাধা প্রদান করত না তাই তিনি সেখানে তার ধর্ম প্রচারের কাজে ব্রত হন। কুরআনের দেয়া তথ্যমতে ইবরাহিম (আ:) ইহুদী বা নাসারা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ একজন মুসলিম। তিনি মূলত ইসলাম ধর্মই প্রচার করতেন। ফিলিস্তিন থেকে ইবরাহিম (আ:) একাধিকবার মক্কায় গমন করেন। এমনকি ইসমাইল (আ.) কে নিয়ে তিনি আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহও নির্মান করেন।

ইসরাঈল ও বনী ইসরাঈল (ইয়াকুব আ. ও তাঁর সন্তানগণ)

ইব্রাহিম আ. এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইয়াকুব আ.। সেই ফিলিস্তিনেই। তবে পরবর্তীতে তিনি হিজরত করে চলে যান তুরস্কের হাররান নামক এলাকায়। সেখানে তার ঔরসে দুইস্ত্রী থেকে জন্মগ্রহণ করেন ১২ সন্তান। প্রথম স্ত্রী লিয়া এর গর্ভে ১০ জন এবং ২য় স্ত্রী রায়েল এর গর্ভে ২ জন। ইয়াকুব (আ:) এর অপরনাম ইসরাঈল হিসাবে তার সন্তানদেরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল। ইয়াকুব (আ:) এর সর্বাদিক আদরের ছেলে ইউসুফ (আ:) ভাইদের হিংসার শিকার হয়ে মিশরে গিয়ে মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পরে বনী ইসরাঈল তথা ইয়াকুব (আ:) এর সকল পুত্র ও নাতি-নাতনী নিয়ে সেখানে চলে যান। প্রসিদ্ধ উক্তি মতে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৭২ জন। সেখানে তারা অবস্থান করেন প্রায় সাড়ে চারশত বছর। এর পর আনুমানিক ১৫৫০ খৃষ্টপূর্ব সনে হিকসোসদের পরাজয় হলে মিশরের ক্ষমতা চলে যায় ফেরআউনদের হাতে। তারা সেখানে বনী ইসরাঈলের

উপর মারাত্মক জুলুম করতে শুরু করে এবং বনী ইসরাঈলরাও পরিপূর্ণভাবে গোমরাহ হয়ে যায়। যার বিবরণ কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় দেয়া হয়েছে।

মুসা আ: ও বনী ইসরাঈলের মিশর ত্যাগ

খৃষ্টপূর্ব ১২৫০ এর দিকে বনী ইসরাঈলে আগমন করেন নবী মূসা (আ:)। আল্লাহর নির্দেশে তিনি বনী ইসরাঈলদের নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে বর্তমান মিশরের সিনাই উপত্যাকায় চলে আসেন। তখন তাদের সংখ্যা ছিল কোন বর্ণনামতে ৬ লক্ষ এবং কোন বর্ণনামতে ৬ হাজার । তবে ৬ হাজার হওয়াটাই প্রনিধানযোগ্য। সেখানে এসে বনী ইসরাঈলেরা শুরু করে অভূতপূর্ব নবীর বিরুদ্ধাচরণ। এর বিবরণও সূরা বাকারা ও মায়েদাসহ বিভিন্ন সূরায় দেয়া হয়েছে।

তারা মূসা আ: কে বলে তিনি যেন তাদের জন্য মূর্তির ব্যবস্থা করেন। তারা এর পূজা করবে। তিনি তাওরাত আনতে গেলে মাত্র ৪০ দিনের ব্যবধানে তারা শুরু করে দেয় বাচুর-পূজা। ইতিহাসে একমাত্র জাতি তারাই যারা তাদের নবীকে মূর্তির ব্যবস্থা করতে আবদার করে। আল্লাহর নির্দেশে নবী মূসা আ: তাদের হুকুম দেন, তারা যেন ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, এখানকার লোকজন খুব শক্তিশালী। এমনকি তারা বলে যে, আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যোদ্ধ করুন আমরা এখানে বসে থাকব। তখন ফিলিস্তিনে ছিল কেনআনীরা।এর ফলে আল্লাহ তাদের উপর আজাব নাযিল করেন। তীহ প্রান্তে তারা ৪০ বছর পর্যন্ত উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে।

ইউশা আ: এর ফিলিস্তিনে প্রবেশ

এরই মধ্যে মুসা আ: ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে প্রেরণ করেন ইউশা (আ:) কে। তিনি তাদের কাছে জিহাদের ওয়াদা দেন। এবং ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে বলেন। প্রবেশকালে حطة বলে মাথানত করে প্রবেশের নির্দেশ থাকলেও তারা حنطة বলে উল্টো হয়ে প্রবেশ করে। তখন খৃষ্টপূর্ব ১১৯০ সন। ইউশা (আ:) এর ইন্তিকালের পরে তারা আবার মূর্তিপূজা শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যে আসেন নবী শামুয়ীল (আ:)।

দাউদ ও সুলাইমান আ: এর ফিলিস্তিন শাসন

সে সময় মুসা আ: এর স্মৃতি সম্বলিত তাবুত ছিল জালুতের হাতে । নবীর পক্ষ থেকে জিহাদের কথা বললে বনী ইসরাঈল তাদের নেতা চায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তালুত কে নেতা বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তারা তাকে মানতে অস্বিকৃতি জানায়। পরবর্তীতেশামুয়ীল(আ:) এর বাহিনীর সাহসী এক যুদ্ধা দাউদ একাই যুদ্ধে এগিয়ে যান এবং পাথর নিক্ষেপে জালুতকে হত্যা করেন।

তারা তালুতকে না মানার কারণ ছিল এই যে সে ছিল বিনইয়ামিনের বংশের। তখনকার বনী ইসরাঈলরা দুভাগে বিভক্ত ছিল। ১- ইয়াহুদা বংশীয় ২- লাভী বংশীয়। যারা দুজনই ছিলেন হযরত ইয়াকুব আ: এর দুই পুত্র।

খৃষ্টপূর্ব ১০০৪ সনে দাউদ আ: এর কাছে নবুয়্যত আসে। তিনি ৪০ বছর পর্যন্ত নবুয়্যতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তারপরে নবুয়্যত লাভ করেন তার ছেলে সুলাইমান (আ:)। তিনিও ৪০ বছর নবুয়্যত ও রাজত্বের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ছেলে ও পিতার রাজত্বের ৮০ বছরই ছিল মূলত বনী ইসরাঈলের ঈমানদার অবস্থায় ফিলিস্তিনে রাজত্বের সময়। সুলাইমান (আ:) বাইতুল মুকাদ্দাসকে পূন নির্মান করেন। যা মূলত হযরত আদম আ: নির্মান করেছিলেন। এব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদিসে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বনী ইসরাঈল তাদের ১০ গোত্র মিলে উত্তর ফিলিস্তিনে নেতৃত্ব কায়েম করে এবং বাকী ২ গোত্র মিলে কায়েম করে দক্ষিণ ফিলিস্তিনে। এ দক্ষিন সাম্রাজ্যের নাম ছিল ইয়াহুদা সাম্রাজ্য।

ইয়াহুদী নামকরন ও ইয়াহুদীদের পতন

পরবর্তীতে আরিসিয়্যীনরা ফিলিস্তিন আক্রমন করে এবং উত্তরে নেতৃত্ব প্রদানকারী দশগোত্রের রাজত্বকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের অস্তিত্ব একেবারেই মুছে ফেলে। রয়ে যায় ২ গোত্র বিশিষ্ট দক্ষিনের ইয়াহুদা রাজত্ব। যারা পরবর্তীতে নিজেদেরকে ইয়াহুদী নামে অভিহিত করে।

খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ সনে তাদের উপর চেপে বসে ইরাকের বুখতে নাস্সার। এবং ইহুদীদের সাম্রাজ্য একেবারে ধ্বংস করে দেয়। এবং ইহুদীদের অনেককে ইরাকে ধরে নিয়ে যায়। প্রতিষ্টিত হয় ব্যাবিলিয়ন সাম্রাজ্য। একপর্যায়ে আগমন করলেন নবী ঈসা (আ:)। শুরু হলো খৃস্টানদের উত্থান।

ফিলিস্তিনে খৃষ্টধর্ম

ঈসা আ: আগমনের প্রায় সাড়ে তিন শত বছর পরে রোমান সম্রাট কন্সটাইন খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং তার মায়ের মাধ্যমে পুরো ফিলিস্তিন খৃস্টানদের আবাসে পরিণত হয়। নির্মিত হয় বহু গির্জা ও এবাদতখানা। খৃষ্টানদের শাসন চলতে থাকে ইসলাম প্রবেশ এর আগ পর্যন্ত।

ইহুদীরা মদীনায়

ইবরাহিম আ: এর বড় পুত্র হযরত ইসমাঈল আ: যাকে তিনি মক্কায় রেখে আসছিলেন তার বংশ থেকে ৫৬০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইহুদীরা তাদের তাওরাতের দেয়া তথ্য থেকে জানতে পারে যে, শেষ নবী আরবে আসবেন এবং ইয়াসরীবে হিজরত করবেন। তাই তারা মদীনায় চলে আসে। কিন্তু রাসুল যখন বনী ইসমাঈলে জন্ম নিলেন তখন তারা হিংসাবশত তাকে অস্বিকার করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে লাগাতার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়। রাসুল সা. মদীনা যাওয়ার পরে তারা সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে শান্তিতে বসবাসের কথা থাকলেও চুক্তি ভঙ্গ করে এবং আহযাবের যুদ্ধের সৃষ্টি করে। ফলে রাসুল সা. তাদেরকে মদীনা থেকে ১৫৩ কিলোমিটার উত্তরে খাইবরে দেশান্তর করেন। পরবর্তীতে হযরত উমর রা. তার শাসনামলে তাদেরকে খায়বার থেকে বের করে দেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার হাতে ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাস হযরত উমর রা. এর শাসনামলে ৫ রজব ১৫ হিজরীতে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রা. এর নেতৃত্বে রোমানদের সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. এর বীরত্বগাথা রণকৌশলে বিশাল রোমানবাহিনী পরাজয় বরণ করে। এবং তখনকার বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করার জন্য বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করা হয়।

সেমতে, ফিলিস্তিন বিজয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয় রাসুলের মহান সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এর হাতে। তিনি প্রথমে ফিলিস্তিনের অন্যান্য অঞ্চল এবং শেষে আল কুদস অবরোধ করেন। শেষ পর্যায়ে উমর রা. এর আগমনের শর্তে খৃষ্টানরা সন্ধি করে এবং আল কুদস মুসলমানদের হাতে সমর্পন করে। সেদিন উমর রা. আপন গোলামকে ঘোড়ায় আরোহন করিয়ে নিজে পায়ে হেটে আল কুদসে প্রবেশ করেছিলেন। নামাজের সময় হলে তিনি তাদের গির্জায় নামাজ না পড়ে বরং মসজিদে চলে যান যেন পরবর্তীতে মুসলিমদের কেউ এই বলে এটা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারে যে, উমর রা. এখানে নামাজ পড়েছেন। এটাই ইসলামের উদারতা। আল্লাহু আকবার। তিনি সেখানে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মান করেন। এবং অনেক প্রশস্ত করেন।

সালাহ উদ্দিন আইয়ূবী

এরপরে ২০ শাবান ৪৯২ হিজরী সনে ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। পরবর্তীতে খ্যাতিমান মুজাহিদ হযরত সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী ৫৮৩ হিজরীতে হিত্তীন যুদ্ধের পর বাইতুল মুকাদ্দাস আবার জয় করেন। এর পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাস এবং ফিলিস্তিন মুসলমানদের শাসনেই ছিল। পরিসংখ্যান মতে ১৫ হিজরী থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মাঝখানে ক্রুসে-ডারদের ১০০ বছর বাদ দিয়ে মোট ৭০০ বছর বাইতুল মুকাদ্দাসের সোনালী যুগ ছিল। ছিল মুসলমানদের হাতে।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে অনেকবার। কখনো সুন্নী আবার কখনো শিয়া ঘরানার মুসলমানদের হাতে ছিল ফিলিস্তিন। সর্বশেষ সময়ে ফিলিস্তিন ছিল উসমানীয় খেলাফতের অধীনে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ফিলিস্তিন

১৯১৪ ইং সনে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যা খৃষ্টানদের মাঝে সংঘটিত হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল খেলাফতের পতন ঘটানো। যাতে তারা সফলও হয়েছিল। কেন্দ্রীয় শক্তিতে থাকা জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরীর সাথে পতন ঘটে উসমানীয় সাম্রাজ্যেরও। এতে আরবদের দুর্ভাগ্যের পেছনে কাজ করে দুজন দুষ্ট লোকের চরিত্র। ১- কামাল আতা তুর্ক। ২- শরীফ হুসাইন। যাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এখানে সম্ভব নয়।

যায়নবাদ ও ইহুদীদের ফিলিস্তিনে স্যাটেলম্যান্ট

এদিকে ইউরোপ ও রাশিয়ায় ছড়িয়ে থাকা ইহুদীরা তলে তলে শুরু করে যায়নবাদি আন্দোলন। আরবীতে صهيون মুলত কুদসে থাকা একটি পাহাড়ের নাম যেখানে হযরত দাউদ আ: এর কবর রয়েছে। ইহুদীরা তাদের আন্দোলনকে এই পাহাড়ের সাথে সম্পৃক্ত করে নাম দেয় যায়নাবাদী আন্দোলন। এটি মূলত ইহুদীদের ফিলিস্তিনে পূনর্বাসন এবং পৃথক রাষ্ট্র গঠনের নিমিত্তে গঠিত একটি সংগঠন।

তারা ১৮৯৭ সাথে সুইজারল্যান্ডে প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেক করে এবং তারপর থেকে প্রতি দুবছর পরপর তারা এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সমাবেশ করতে থাকে। তারা প্রথমে সরাসরি উসমানী সম্রাজ্যের কাছে ফিলিস্তিন চাইলে তৎকালীন সম্রাট তাদের আরজী নাকচ করে দেন। এরপর থেকে তারা শুরু করে ব্রিটিশ ও মার্কিনীদের মাধ্যমে ফিলিস্তিন দখল করার চক্রান্ত।

ইংরেজদের হাতে ফিলিস্তিন

বিভিন্ন দেশের মতো ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিন চলে যায় ইংরেজদের দখলে। তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর ১৯১৭ সনের ২রা নভেম্বর ইহুদী-দের লেখা এক পত্রে ফিলিস্তিনে তাদের ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। এটি পরবর্তীতে জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়। এর পর থেকে শুরু হয় ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আবাস গ্রহণ। ব্রিটিশরা যতদিন ফিলিস্তি-নের ক্ষমতায় ছিল ততদিন তারা একাজটাই মূলত করেছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইহুদীদের ফিলিস্তিনে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদীরা ছিল মাত্র ৮% যে সংখ্যা ১৯৪৮ সালে দাড়িয়েছিল ৩২% এ।

অবস্থা দৃষ্টে ১৯৩৩ ইং সনে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন সিরীয় আলেম ইজ্জুদ্দিন কাস্সাম। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৩৫ সনে শহীদ হন ইজ্জুদ্দিন। কিন্তু আন্দোলন চলতেই থাকে। এক পর্যায়ে ইংরেজরা ঘোষনা করে যে, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের আগমন বন্ধ করবে এবং তাদের অন্যান্য দাবি মেনে নিবে। আফসোস! যদি মুসলমানরা তাদের প্রলোভনে প্রলোব্ধ না হতেন তাহলে হয়ত তখনই কোন ফয়সালা হয়ে যেতো। আন্দোলনকারীরা তাদের কথায় শান্ত হয়ে যান। ইংরেজরা এর জন্য সময় চায় ১০ বছর।

২য় বিশ্বযুদ্ধ ও ফিলিস্তিন

এরই মধ্যে সংঘটিত হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সনে। যুদ্ধে জার্মানীর সাথে যোগ দেয় আরবরা। এবং ব্রিটিশদের সাথে যোগ দেয় ইহুদীরা। ফলে যুদ্ধ চলাকালীন এবং ব্রিটিশদের জয়ের পরে ব্রিটিশদের থেকে বিশাল বিশাল অস্ত্রের ভান্ডার জমা করে তারা ফিলিস্তিনে। যুদ্ধে পরাজিত হয় জার্মানরা সাথে আরবরাও। এদিকে ঘটে আরেক কাহিনী। হিটলার জার্মানে নির্বিচারে ইহুদীদের হত্যা করা শুরু করে। ফলে ইহুদীদের প্রতি বিপক্ষদল ব্রিটিশ-মার্কিনসহ পৃথিবীর শক্তিধরদের মায়ার নজর পড়তে থাকে। পরাজয়ের পরে আরবরা বিপক্ষদল ব্রিটিশদের পরামর্শে গঠন করে আরবলীগ। (আফসোস) তবে তারা লীগ থেকে বাদ রাখে ফিলিস্তিনকে। উদ্দেশ্য হলো, যেন ফিলিস্তিনে সহজে ইহুদীদের সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগ করে দেয়া যায়। ইউরোপিয়ানরা তাদের দেশে থাকা সকল ইহুদীকে পাঠাতে থাকে ফিলিস্তিনে।

দখলদার ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা ও আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ

১৯৪৭ সালের ২৩ নভেম্বর জাতিসংঘে ফিলিস্তিনকে দুইভাগে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়। অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কার্যকর হয় এই প্রস্তাব। প্রস্তাব অনুযায়ী ৫৮ ভাগ জায়গা নিয়ে গঠিত হবে ইসরাঈল এবং ৪২ ভাগ জায়গা নিয়ে গঠিত হবে ফিলিস্তিন। জেরুসালিম ও বেথেলহাম থাকবে জাতিসংঘের অধীনে।

১৯৪৮ সনের ১৪ মে ব্রিটেন চলে যায় ফিলিস্তিনের ক্ষমতা ছেড়ে। ইংরেজদের চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই ডেভিট বেন গুরিয়ন ঘোষনা করে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসরাঈলের স্বাধীন রাষ্ট্রের। সেখান থেকেই সূচনা ইসরাঈলের। ঘোষনার ১১ মিনিটের মাথায় স্বীকৃতি দেয় মার্কিনীরা। স্বীকৃতি প্রদানকারীদের তালিকায় যুক্ত হয় ইংরেজ এবং রাশিয়ানরাও।

পরের দিন ১৫ ই মে আরবলীগ আক্রমন করে ইসরাঈলে। ব্রিটিশ ও মার্কিনীদের দেয়া অস্ত্র ও সহযোগিতায় তারা আরবদের পরাজিত করে। বের করে দেয়া হয় সাত লাখ ফিলিস্তিনীদেরকে নিজ জন্মভূমি থেকে। বানিয়ে ফেলা হয় শরণার্থী।

এরপর ১৯৬৭ সালে জুন মাসে ইসরাইল আক্রমন করে মিসর ও সিরীয়ায়। দখল করে নেয় বাকী ৪২ ভাগও। সাথে মিশরের সিনাই উপাত্যাকা ও সিরীয়ার গোলান মালভুমির অধিকাংশ। ১৫ বছর পরে ১৯৮২ সালে সিনাই ফিরিয়ে দিলেও মালভুমি আর ফিরিয়ে দেয়নি ইসরাঈল। জাতিসংঘ থেকে বারবার বলা হয়েছে যে, ইসরাইল যেন দখলকৃত ৪২ ভাগ ফিলিস্তিনীদের ভুমি ফিরিয়ে দেয় কিন্তু তারা আজও ফিরিয়ে দেয়নি। উল্টো আরো দখলকৃত ভুমিতে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। নানা অজুহাতে দখলকৃত ভুমিতে বানিয়ে যাচ্ছে দালানকোটা ও অফিস আদালত। বিভিন্ন ইস্যুর জন্ম দিয়ে খতম করে যাচ্ছে নির্যাতিত ফিলিস্তিনীদের। আল্লাহ তাআলা ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করে দিন। আমীন।

কান্ডারী, দৃঢ় হাতে হাল ধরো এ জাতির

মুসা আল হাফিজ

সরল অর্থে কৃওমী মাদ্রাসা কথাটির অর্থ হলো জাতীয় শিক্ষাগার। জাতীয় শিক্ষাগার বলতে মুসলিম জাতীর শিক্ষাগার ইসলামের যে শিক্ষাদর্শণ তার একটি প্রতিকী রুপরেখা এই শিক্ষাগারের কাছে প্রত্যশা করা হয় এবং তার মধ্য থেকে ইসলামের সত্যিকার জ্ঞান তাত্ত্বিক প্রতিনিধিত্ব সম্পাদিত হবে। এই প্রত্যয় থেকেই মূলত এই ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মুসলিম জাতীর শিক্ষাগার বলে অভিহিত করা হয় । এটি তো তাত্ত্বিক কারণ । আরেকটি কারণ আছে ঐতিহাসিক সেটি হল ভারত উপমহাদেশে উপনিবেশ শাসনামলের সেই ভয়াবহ দূর্যোগকালে যখন এদেশের জনগণের মুসলিম পরিচিতিকে মাটির তলায় স্থায়ীভাবে পুতে ফেলার প্রক্রিয়া চলছিল এবং এর বাস্তবায়নে ইংরেজদেও সামরিক সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কৌশল সমূহ হালুম হুলুম করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন মুসলিম জাতিসত্তার সংরক্ষন ও ইংরেজ তাড়িয়ে উপমহাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে মুসলিম গণভিত্তির নৈতিক আর্থিক ও সামাজিক সমর্থনের ভিত্তিতে সরকারী কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে যে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্টা হয়েছিল সেটি তার পরিচিতিতে কৃওমী মাদ্রাসা আবির্ভাবটি ব্যবহার করতো । এই দারুল উলুম ইংরেজ রাজত্ব কে অস্বীকার করলো এবং তার শিক্ষা সংস্কৃতি, ভাষা ও ভাবধারাকে চ্যালেঞ্জ করে এর বিকল্প সংস্কৃতি বিকল্প শিক্ষা বিকল্প ভাবধারা জনগণের সামনে উপস্থাপন করলো। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইংরেজরা এদেশের শাসন করলেও এদেশের জনগণকে মানসিকভাবে পরাধীন করতে পারেনি। জনগণের মনের মাটিতে ইসলামী চেতনা ভিত্তিক স্বাধীনতার তাড়নার বাতি প্রজ্জলিত করেছিল দারুল উলুম দেওবন্দ। এবং সেই অগুনই পরবর্তিতে লেলিহান রূপ ধারণ করে রুদ্ররুষে যখন ফুসে উঠলো তখন ইংরেজরা জান বাচাঁতে উপমহাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে আটলান্টিকের ওপারে পাড়ি জমাল। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিল । এবং সেই পাকিস্তান থেকেই পরবর্তিতে পৃথক হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের পতাকা আকাশে উড্ডয়ন করে। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় পাঠক মাত্রই বিচার করবেন যে, ভারত পাকিস্তান এবং শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দেওবন্দের চেতনায় উজ্জিবিত কওমী মাদ্রাসা গুলোর আবদান কতটা ব্যপক ও সুদুর প্রসারী । যদি দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত না হতো তাহলে কি হতো?

এক নম্বর উত্তর হলো ভারত উপমাহাদেশ পরিণত হতো আরেকটি আন্দুলুসিয়ায়। ইউরোপের স্পেনে কয়েকশ বছর মুসলমানেরা রাজ্য শসন করলেও ইহুদি খৃষ্টানদের সম্মিলিত আক্রমনের ফলে স্পেনের মুসলমানদের একটি অংশকে আগুনে দগ্ধ হতে হয়েছে, আরেকটি অংশকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে হয়েছে, আরেকটি অংশকে ধরে ধরে ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল ।

পরবর্তিতে এমন হলো যে সেখানে মুসলমানদের ধ্বংশের স্মৃতি ছাইয়ের পাশে ক্রুন্দন করার মতো একটি লোক রইলো না । এবং মুসলমানদের গৌরবময় শাসনামলের সাক্ষী হিসাবে আল-হামরা গ্রানাডা, সেভিল টলেডো ইতাকাদিও মসজিদ ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলোই বেচেঁ রইল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সেই মসজিদ গুলোকে হতে হলো গির্জায় কিংবা ঘোড়ার আস্তাবল আর শিক্ষাগার গুলো হয়ে উঠলো মুসলিম বিশ্বকে জ্ঞানগত ভাবে পরাজিত করার একটি গবেষণাগার । স্পেনের সেই পরিনতি কেন হলো? সেখানে বিজ্ঞান চর্চার জন্যে ছিলো এমন সব প্রতিষ্ঠান যার দৃষ্টান্ত ছিলনা তৎকালিন পৃথিবীর কোথাও । সেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এমন উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, তার সামনে গোটা ইউরোপকে হতদরিদ্র মনে হতো । সেখানে সামরিক, সংস্কৃতিক ও শিল্পের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো যে, তার প্রভাবেই আধুনিক পৃথিবীর অস্তিত্ব গড়ে উঠে । সব কিছুই ছিল কিন্তু ছিলনা একটি জিনিস । সেটি হলো অর্থনৈতিকে, জ্ঞান বিজ্ঞানকে, সামরিক শক্তিকে সংস্কৃতিক কার্যক্রমকে এবং শিল্প ও সমাজকে মুসলমানদের মৌলিক বুনিয়াদ ও মৌলিক আত্মপরিচয় মৌলিক জ্ঞান ও সত্যিকার রুহানী শক্তির আলোকে সঠিক খাতে প্রয়োগ ও বিকাশের পথনির্দেশের জন্য সংঘবদ্ধ কোন শক্তি এখানে ছিলনা । ভারত উপমহাদেশে সেই শক্তি গড়ে উঠলো দারুল উলুম দেওবন্দের মাধ্যমে । দারুল উলুম দেওবন্দের মাধ্যমে মুসলিম আত্মপরিচয় জ্ঞানের সাথে কর্মের যোগ, জাগতিক উন্নয়নের সাথে হৃদয়ের সংযোগ এবং তাওহীওদ ও রিসালতের ভিত্তিতে ঐক্যের এক এমন পাঠাতন গড়ে উঠেছিল, যেখান থেকে জাতির প্রতিটি দূর্যোগে প্রতিটি প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতিতে লাইট হাউসের সুতিব্র ফোকাসের মতো জাতীয় জীবনের নিরন্দ্র অন্ধকারে আলোবিকিরণ করা হয়েছিল। ফলে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠে এবং জনগনের রাজনৈতিক ও আধ্যত্মিক নেতৃত্ব শূণ্যতায় পতিত হয়নি ।স্পেনের মুসলমানরা ছিলো এর বিপরীত । তারা সেই সংকটে পতিত হয়েছিল। সামাজিক জীবনে মুসলিম পরিচিতি ভিত্তিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল । দারুল উলুম দেওবন্দ ভারত উপমাহদেশে তা হতে দেয়নি। দেওবন্দের সন্তানেরা দেশের প্রতিটি জনপদে কওমী মাদ্রাসার মাধ্যমে সেই গুরুভার সম্পাদন করেছিল । কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, সেটা প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের কথা এরপর জাতীয় আন্তজার্তিক রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বহু রুপান্তর ব্যপক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনের গতির সাথে নিজেকে যুক্ত করে উপযুক্ত দিকনির্দেশনার যে দায়িত্ব ক্বওমী মাদ্রাসা অতিতে যে আঞ্জাম দিয়েছিলো এখন মনে হচ্ছে এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার মধ্যে কোথায় যেন এক গুরুতর পিছুটান রয়েছে। সমসাময়িক বিশ্ব ও জ্ঞান বিজ্ঞান, জাতীয় জীবনের মৌলিক কাঠামো যে গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্টতার একটি শীথিলতা পরিদৃষ্ট, সময় এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত । কিন্তু আমরা বসে আছি কল্পিত এক মানসিক আবদ্ধতা দিগন্তে। এ থেকে উত্তরণ অপরিহার্য । সেই উত্তরণ যত দ্রুত সংঘটিত হবে, দেশ ও জাতির ততই কল্যাণ। কেননা এখনো এ দেশকে আন্দুলুসিয়ায় বানানোর ষড়যন্ত্র বিদ্যমান । সেই ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ দূরীভুত করতে পারে ক্বওমী মাদ্রাসাই এজন্য উলামায়ে কেরামদের ব্যাপক গণসম্পৃক্তি জ্ঞান- বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও ভাষা-সংস্কৃতির গতি ধারায় বলিষ্ট সংযুক্তির বিকল্প নেই।

ফারুক্বী পয়গাম

লন্ডন থেকে মুফতি মাওঃ হাসান নুরী চৌধুরী

ফারুক্বীয় পয়গাম মানেই কুরআনী দর্শন। ফারুক্বী পয়গাম মানেই ওমরীদর্শন।কুরআনের কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর ফারুক (রা:) এর চিন্তার বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে মাকামে ইব্রাহীমের সামনে দাঁড়িয়ে ওমর (রা:) আরজ করলেন- ইয়া রাসুল (সা:), আমার মন চায় মাকামে ইব্রাহীমকে ক্বিবলা হিসেবে দু'রাকাআত নামাজ আদায় করতে। রহমতে আলম (সা:) ইরশাদ করেন, ওমর তুমি কি জান তুমি হচ্ছ আমার দোয়ার ফসল । আমি আল্লাহ তায়ালার শাহী দরবারে কামনা করেছিলাম- হে আল্লাহ, ইবনে হিশাম অথবা হিবনে খাত্তাব এই দুই ওমরের মধ্যে একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা তোমার ব্যাপারে দোয়া কবুল করেছেন। তেমনিভাবে আমি হচ্ছি আমার ধর্মীয় পিতা হযরত ইব্রাহীম খলিল (আ:) এর দোয়ার ফসল। আমারও মন চায় মাকামে ইব্রাহীমকে সম্মান জানাতে । হযরত ওমর (রা:) আরজ করেন, ইয়া রাসুলল্লাহ (সা:) তাহলে আসুন আপনি ইমাম হউন আর আমি মুক্তাদি হয়ে দু'রাকাআত নফল নামাজ আদায় করি। হুজুর (সা:) ইরশাদ করেন, ওমর তুমি কি জান শরীয়তের বিধি বিধান আরশে আজিম থেকে আসে।

প্রিয় পাঠক চিন্তা করুন বায়তুল্লাহ শরীফের সামনে আল্লাহ'র নবী মাকামে ইব্রাহীমকে শ্রদ্ধা জানাবেন কিন্তু আরশে আজিমের নির্দেশের অপেক্ষা করেন। অথচ আমরা নিজেই শরীয়তের বিধি বিধান বানিয়ে ধর্মের নামে চালিয়ে দেই এবং বলি এটাতো আর মন্দ কিছু বলি নাই । হুজুর (সা:) এবং খলিফাতুন মুসলিমিনের মধ্যে আলোচনা চলছে এমন অবস্থায় জিব্রাঈল (আঃ) পয়গাম নিয়ে আসেন ইয়া রাসুলল্লাহ আপনার ওমরের চিন্তার বহিপ্রকাশ ঘটিয়ে রাব্বুল আল-আমীন বিধান জারি করেছেন এবং বলে দিয়েছেন তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর (সুরা বাক্বারা) । অনেক আয়াতে ওমর (রা:) এর ইচ্ছার বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাইতো হুজুর (সা:) ইরশাদ করেন, আমার পরে যদি নবী আসার প্রয়োজন হত তাহলে আল্লাহ তায়ালা ওমরকে নবুওয়্যাত দান করতে। হায় আপসোস আজ যদি মুসলিম বিশ্ব ফারুকী পয়গামের বাস্তবায়ন করত তাহলে বিশ্বের মানচিত্রে মুসলিম জাতি আজ মাতা উচু করে দাঁড়াতে পারত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজ ইউরোপ আমেরিকা সহ উন্নত বিশ্ব ফারুকী পয়গাম বা ওমরী দর্শনকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে তারা আজ বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে । আর আমরা তাদের দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ । আমাদের রাষ্ট্রের কার্যক্রম তাদের কথামত চলছে ।বন্ধুবর মাওলানা আবু তাহের ফারুকী ২০০৪ সালে নবীগঞ্জ থানাধীন করগাঁও ইউনিয়নের তাজপুর (মাধবপুর) গড়ে তুলেন জামেয়া ফারুক্বীয়া নামে একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার ফলে উনার নামের সাথে দেশ বরেণ্য উলামা মাশায়েখগণ জুড়ে দেন ফারুকী উপাধি এবং তাকে বিশেষ করে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তার ইচ্ছা হচ্ছে ফারুক্বী পয়গাম বা ওমরি দর্শনের বাস্তবায়ন। আল্লাহ তার এ মহৎ উদ্দেশ্যকে কবুল করুন । নবীগঞ্জ থেকে ইনাতগঞ্জের যাওয়ার রাস্তাটির পার্শ্বে অন্তত মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চয় প্রশংসার দাবীদার । আমি দ্বীনি এই প্রতিষ্ঠানটি দেখে এসেছি। প্রতিষ্ঠানটির উত্তোরোত্তর সফলতাই আমার কাম্য। দ্বীনি এই প্রতিষ্ঠানটি যেন আল্লাহ কবুল করেন এই দোয়া করছি। পাশাপাশি প্রবাসী ভাইবোন বিশেষ করে হবিগঞ্জ তথা নবীগঞ্জের মানুষের খেদমতে আকুল আবেদন আপনারা প্রতিষ্ঠানটিকে ভিজিট করুন । এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সুপরামর্শ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির পাশে এগিয়ে আসুন । পরিশেষে বলছি প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠুক একটি আদর্শ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আল্লাহ আমাদের কে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের আজীবন সাহায্য সহযোগিতা করার তৌফিক দান করুন আমিন।

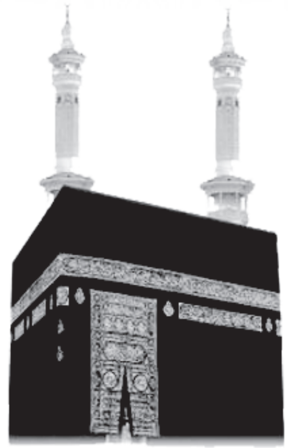

কা'বা শরীফকে কিভাবে তৈয়ার করেন

মাওলানা নাজমুল ইসলাম সাদিক (মক্কার প্রতিনিধি)

কোরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,
বায়ুতুল্লাহ শরীফ হজরত ইব্রাহীম (আ.) তৈয়ার করেন। ওলামাগন লিখিয়াছেন, ঐ ঘর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি হইতে পারে যাহা বানাইবার আদেশ করেন স্বয়ং পরওয়ার দেহার। নকশা তৈয়ারীর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন হজরত জিব্রাঈল (আঃ)। হযরত ইব্রাহীম খলীলের মত বড় পয়গম্বর হইলেন উহার রাজমিস্ত্রী আর যুগালী হইলেন হজরত ইছমাঈল জবিহ্উল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

সেই ঘর কত বড় আজমতের অধিকারী। ইবনে ছাদ (রঃ) রেওয়ায়েত করেন, বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণকালে হজরত ইব্রাহীমের বয়স একশত বৎসর আর ইছমাঈলের বয়স ত্রিশ বৎসর ছিল। কা'বা শরীফকে কে প্রথম এবং কে পরে তৈয়ার করেন উহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-

(১) প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে সর্বপ্রথম হজরত আদম (আঃ)-এর জন্মে দুই হাজার বৎসর পূর্বে ফেরেশতাগন বায়ুতুল্লাহ শরীফ তৈয়ার করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রথম আল্লাহ্ পাকের হুকুমে "কুন" শব্দ দ্বারা তৈয়ার হয়, যেকানে ফেরেশ্তাদেরও কোন দখল ছিলো না।

(২) দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে হজরত আদম (আঃ) তৈয়ার করেন।

বর্নিত আছে, লেবানন, তুরে সীনা, তুরে জী-তা, জুদী, হেরা এই পাঁচটি পাহাড়ের পাথরের সমম্বয়ে হজরত আদম (আঃ) উহা তৈয়ার করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন হজরত আদম (আঃ)। তার উপর আছমান হইতে বায়তুল মামুরকে রাখা হইয়াছে। অতঃপর হজরত আদমের এন্তেকালের পর অথবা নূহের তুফানের সময় উহা আছমানে উঠাইয়া নেওয়া হয়।

(৩) বলা হয় যে, আদম (আ.) এর ছেলে শীস (আঃ) উহা তৈয়ার করেন।

(৪) হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তৈয়ার করেন, হইা ঐতিহাসিক সত্য, কোরআর দ্বারা প্রমাণিত। বলা হয়, উক্ত ভিত্তি নয় গজ উঁচু, ত্রিশ গজ লম্বা এবং তেইশ গজ চওড়া ছিল। তখন কোন ছাদ ছির না, ভিতরে একটি কুয়া ছিল। কা'বা শরীফের নামে মানত করা বস্তুসমূহ তথায় নিক্ষেপ করা হইত।

(৫) আমালেকা গোত্র পঞ্চম বারে ও

(৬) জোরহাম গোত্র ষষ্ঠবারে তৈয়ার করে। তাহারা হজরত নূহের বংশধর চির।

(৭) হুজুরে পাক (ছঃ) এর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে কোরাইশগন উহা নতুন করিয়া তৈয়ার করেন। হইাতে স্বয়ং নবী করীম (ছঃ)-ও শরীক ছিলেন।

তিনি আপন কাঁধে করিয়া পাথর যোগন দিয়াছেন। এই সময়ে হাজারে আছওয়াদ নিয়া কোরাইশদের মধ্যে যুদ্ধে উপক্রম হইয়াছিল। হুজুর (ছঃ) উহার ফায়ছালা এইভাবে করেন যে, একটা চাদরের মধ্যে পাথরটা আমি রাখিতেছি। তোমরা প্রত্যেক গোত্রের এক এক জন লোক উহার এক এক কিনার ধরো। এইভাবে দেওয়ালের পাশে নেওয়া হইলে বলিলেন, সকলে আমাকে অনুমতি দিয়া উকিল বানাইলে পাথরটা আমি যথাস্থানে রাখিতে পারি, সকলেই অনুমতি দিল। হুজুর (সঃ)-নিজ হাতে যথাস্থানে উহা রাখিয়া দিলেন। এইবার তৈয়ারী উপলক্ষে কাফেরগন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ইহাতে কোন হারাম উপার্জিত পয়সা লাগাইবে না। তাই হালাল উপার্জনের পয়সা শেষ হইয়া যাওয়াতে হাতিমের দিকে কিছুটা দেওয়াল পিছু হটাইয়া দেওয়া হয়। কাজেই কা'বার কিছুটা অংশ বাহির থাকিয়া যায়। দরজাও ইব্রাহীম (আঃ)- এর ভিত্তির খেলাফ কিছুটা উঁচু করিয়া দেওয়া হয়, যেন সিঁড়ি ব্যতীত প্রত্যেকেই উঠিতে না পারে। হুজুর (ছঃ)-এর বড় আরজু ছিল কাবা শরীফকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর নতুন করিয়া গড়িবার, কিন্তু হুজুরের জীবনে তাহা সম্ভব হয় নাই।

(৮) চৌষট্টি হিজরীতে এজীদের সেনাবাহিনী যখন আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের উপর আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আগুনের গোলায় কাবা শরীফের গেলাফ জ্বলিয়া যায়, দেওয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ঐ সময় এজীদের মৃত্যু সংবাদ আসিলে সৈন্যগণ চলিয়া যায় এবং হজরত আবুল্লাহ বিন জোবায়ের (রাঃ) কাবা ঘরকে ভাঙ্গিয়া হুজুর (ছঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী নতুন করিয়া গড়েন। হাতীমকে ঘরের ভিতর শামিল করেন এবং দরজা নীচু করিয়া উহার মোকাবেলায় আর একটি দরজা তৈয়ার করেন , যেন লোকজন এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া আর এক দরজা তৈয়ার দিয়া বাহির হইতে পারে। চৌষট্টি হিজরীর জমাদিউল আখেরে ঐ কাজ শুরু হইয়া পয়ঁষট্টি হিজরীর রজব মাসে শেষ হয়। আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের (রাঃ) ঐ খুশীতে এক জবরদস্ত দাওয়াতের এন্তেজাম করেন এবং বারো শত উট জবেহ করিয়া খাওয়ান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এজীদের সেনাবাহিনীরর হামলার সময় হজরত ইছমাঈলের পরিবর্তে জন্নাতের যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল, কাবা শরীফে রক্ষিত সেই দুম্বার শিংটা হারাইয়া যায়।

(৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের পর খলীফা আবদুল মালেক এবনে মারওয়ানের শাসনকালে হাজ্জাজ বিন ইউছুফ এই বলিয়া প্ররোচিত করে যে, আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের কাবা শরীফের গঠনে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। হুজুর (সঃ) এর সময় কাবা শরীফের গঠন ছিল তাহা এখন নাই। খলিফা আবুল মালেক হাজ্জাজকে কাবার যে গঠন পূর্বের মত করার অনুমতি দিলে সে আগের মতো কাবা শরীফের পূর্বের দরজা উঁচু করিয়া তার বিপরীত দিকের দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং হাতীমের দিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পূর্বের মতই হাতীমের অংশের বাহিরে রাখিয়া দেয়। আর ভিতরের অংশ ভরাট করিয়া মেঝে উঁচু করিয়া দেয়। হাজ্জাজ হিজরী ৭৩ সালে এ পরির্বতন করে। আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ বিন ইউছুফের সেই গড়নের উপর কাবা শরীফ রহিয়াছে। খলিফা হারুনুর রশীদ এবং অন্যান্য খলীফাগণ চাহিয়াছিল উহা ভাঙ্গিয়া হুজুর (ছঃ)-এর মন্শা মোতাবেক আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের মত আবার গড়িবে, কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কেননা ইহাতে কাবা ঘর রাজা বাদশাগণের খেল তামাশার বস্তুতে পরিণত হইবে।

ফিরে দেখা জামেয়া ফারুক্বীয়া

সুরুজ্জমান চৌধুরী

এক পড়ন্ত বিকেলে আমার ছোটভাই 'মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী'র সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম। তিনি সিলেটে থাকেন। ব্যবসা বাণিজ্য আররাজনৈতিক নেতা হিসেবে সভা সেমিনার নিয়ে তিনিও খুব ব্যস্ত মানুষ। আমি প্রবাসে থাকি, তাই দেশের সকলের সাথে সব সময় দেখা করতে পারিনা । প্রবাসী জীবন বড়ই দূর্বিসহ। আমার জীবনটা তার ব্যতিক্রম নয়। প্রবাসে থাকতে থাকতে দেশের প্রায় অনেক বন্ধু বান্ধবকে হারিয়ে ফেলেছি। অনেক বড় বড় ওলি বুজুর্গ এর জানাযায় উপস্থিত হতে পারিনি । এমনকি নিজের গর্ভধারীনি মা'র জানাযায় ও উপস্থিত হতে পারিনি। আব্দুল মালিকের সাথে আলাপকালে সে বলল আপনাকে আগামীকাল নবীগঞ্জের তাজপুরে বেড়াতে নিয়ে যাব । তাজপুর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেটা আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসব ।

তার কথামত পরের দিন নবীগঞ্জের তাজপুরে জামেয়া ফারুকীয়া মাদারাসা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলাম মাদরাসার দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ মনোমুগ্ধকর আবহাওয়া ও পার্শ্ব এলাকার সবুজ শ্যামল প্রান্তর আমাকে সত্যিই প্রানস্পর্শি সাড়া জাগিয়েছে। মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবু তাহের ফারুকী এক বিরল ব্যাক্তিত্ব । যার সাথে ফোনে আলাপ হলেও তার নিরলস প্রচেষ্টা ইংল্যান্ডে বা ইউরোপের যে কোনরাষ্ট্রে থাকেন আর অজস্র পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে গড়ে তোলা একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর আগে আর কোনদিন দেখিনি । মুহতামিম সাহেবের অনুপস্থিতিতে তার মাদরাসা মন ভরে দেখলাম। মাদরাসার দৃষ্টিনন্দন চেহারা উপভোগ করলাম । মাদরাসার পরিবেশ, শিক্ষা কাঠামো, আধুনিক শিক্ষারবিস্তর প্রসারতা, আরবি শেষ করে ক্বওমী মাদরাসার সিলেবাসে আধুনিক শিক্ষার যে দৃষ্টান্তমূলকসমন্বয়তা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে । বলতে গেলে একজন মানুষের পক্ষে এমন সু- শৃংখলা পদ্ধতিতে অনুসন্ধিৎ সুসাফে-ল্যর গতি নিয়ে পথ চলা নিজেকে বিলীন করা ছাড়া বৈ কিছু নয় । আশ্চর্য হলাম এমন অবস্থার বাস্তব রূপ অবলোকন করে। যা স্মৃতি স্পটে আজো দাউ দাউ করে ভেসে আসছে।

আমি বিলেতে থাকি । আমার মতো হাজারো লোক বিলেতে থাকেন। আমাদের মতো এক জন মাওলানা আবু তাহের ফারুকী তিনিও বিলেতে থাকেন।

কিন্তু সকলের বিলেতে প্রবাস এক মাপের নয়, তা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে প্রমাণ করেছেন মাওলানা আবু তাহেরের মত কিছু বিরল ব্যক্তিরা । সাধারণত বিলেত প্রবাসীরা প্রবাসে থেকে নিজের সংসার, আত্মীয় স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক, ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যা ঘাটিয়ে নিজেকে স্বস্থির রাখা অনেক কঠিন। তাছাড়া যারা

তাদের দিকে এলাকার অনেক গরীব, এতিম লোকেরা চেয়ে থাকে সাহায্য সহায়তা পাবার জন্য। এ নিয়ে ও আলাদা ভাবতে হয় প্রবাসী-দের। এত জামেলা জটিল তার মধ্য দিয়ে ইহলৌকিক সকল খাহিশের মাথায় কুঠার মেরে যিনি নিজেকে পরলৌকিক জীবন কে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠা বিফলে যাবার কথা নয়। সাম্প্রতিক বিশ্বে সভ্যতার ধ্বজাধারী কথিত মোড়লরা . আধুনিকতার উচ্চ শিকড়ে চড়ে বসার নামে সামাজিক অবক্ষয়ের যে হ্রাস ক্রম বর্ধিত করছে তার যুক্তিযুক্ত ও শিক্ষনীয় জবাবের লক্ষ্যেই মাওলানা আবু তাহের ফারুকীর এ ক্রমবর্ধমান প্রয়াস । এ সমাজের বর্তমান হালহাকিকত, মানুষের সামাজিক বৈষম্যতা, শিক্ষানীতির ব্যাপক নিম্নমুখি-পরিবর্তন, সভ্যতার নামে অশ্লিলতার উল্লাস, আধুনিতার নামে নগ্নতা চর্চা আর সমান অধিকারের নামে চরম বৈষম্য সৃষ্টির যে অঘে-াষিত ক্রুসেড চলছে, তার দৃষ্টান্তমূলক জবাবের পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছেন মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী । ছোট্ট একটি মাদরাসা জামেয়া ফারুকিয়া ।

এ মাদরাসাই হতে পারে অন্তত বাংলাদেশের একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হতে পারে আদর্শ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। তার পরিকল্পনা, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান- ধারণা এ আবাসই বহন করছে । আমি মাদরাসায় প্রবেশ করে মাদরস-ারশিক্ষা ব্যবস্থার কিছু নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত হলাম। মাদরাসার বর্তমান শিক্ষানীতি কোনপদ্ধতিতে হচ্ছে তা শুনলাম । একটা কৃওমী মাদরাসার .শিক্ষাব্যবস্থা এমন হতে পারে! এটা আমি এখানে আসার আগে কোন-দিন জানতামনা । আশ্চর্য হলাম এবং নিজেকে অবহেলিত মনে করলাম, এজন্যই যে, আমার দ্বারা এমনপরিকল্পনা কেন আশাকরা গেলনা । এ জাতীকে সুস্থ বিবেক ও মার্জিতজ্ঞান দান করা সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেনীর লোকদের কাজ । জামেয়া ফারুকিয়া মাদরাসায় ছাত্রদের দৈনন্দিন যে অনুশীলন, শিক্ষা বব্যস্থার যে আধুনিকায়ন, পরিবেশ ও আদাব আখলাকের যে মার্জনীয় পরিস্থিতি তা সত্যিই অবাক হওয়া মত

স্মারকগ্রন্থে লেখা আহ্বান

আগামী ২০২৫ সালে প্রকাশিত হবে

ফারুক্বী স্মারকগ্রন্থ

কি আছে ফারুক্বী স্মারকগ্রন্থে?

এ গ্রন্থে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ব্যবসা বাণিজ্য সহ যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত লেখা দেশের বিশিষ্ট কলামিস্ট, সাংবাদিক এবং খ্যাতনামা আলেম উলামা পীর মাশায়েখদের লিখিত প্রবন্ধ থাকবে।

এ ছাড়া ফারুক্বী স্মারকগ্রন্থে নবীন, প্রবীণ লেখক-লেখিকাদের প্রতি ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক সমকালীন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর (মাদবপুর) মদ্রাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

যোগাযোগ ঃ ০১৭২৬০২২৭৭৮, ০১৭৫৬৪৭৮৭৫২

সু-শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড

আনহার চৌধুরী

বাংলা ভাষা এদেশের মাতৃভাষা। মুসলমান ছাত্র ছাত্রীরা আরবী, উর্দু, হিন্দি এবং ইংরেজীর ন্যায় বাংলা ভাষার অধ্যয়ন করা ও অতি জরুরী। যতদিন পরীক্ষার পড়া থাকে তত দিন ছাত্র- ছাত্রীদের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, যত্ন, পরিশ্রম থাকে । এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে মাওলানা আবু তাহের ফারুকী সাহেব 'জামেয়া ফারুকিয়া তাজপুর মাদরাসা' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে সাহসী সংগ্রামী মানুষের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপস্থাপিত মাদরাসাটিতে আধ্যাত্মবাদ এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি যে আহবান ধ্বনিত হচ্ছে সে জন্য আমার নীরব ধ্বনি উঠছে স্বাগত হে স্বাগত।

প্রাসঙ্গিক ক্রমে বলা আবশ্যক যে, বিশেষ করে নবীগঞ্জের এই এলাকাটি হচ্ছে সেই এলাকা যা শিক্ষাদিক্ষায় নানা কারণেই পিছিয়ে পড়েছিল। এই কারণেই সম্ভবত মাওলানা সাহেব গরীব ধনী নির্বিচারে সকল শ্রেনীর শিশু কিশোরদের সার্বজনীন শিক্ষার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য মাদারাসাটি এই গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেন নিজ খরচে । এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য তিনি যদি একটি সৎ বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরী করতে পারেন, যারা শিক্ষা- দীক্ষা সম্পর্কে ভালো বুঝেন ও এর প্রতি যাদের পুরোপুরি কমিটমেন্ট থাকবে।

এই অঞ্চল থেকে ভালো মানুষ যোগাড় করে তাদেরকে অনুরোধ করুন । টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে। এতে মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা উপকৃত হবে। অতীতে নবীগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে দেশ প্রেমের প্রশ্ন তুলে প্রবাসী নবীগঞ্জবাসীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীতে সহায়তা করেছেন। সদ্য প্রতিষ্টিত মাদরাসা মসজিদের কেন্দ্রবিন্দু পরিচালনার দায়ভার যদি উচ্চ কমিটির থাকে তাহলে নয় মৌজা পরিচালিত 'আলীয়া মাদরাসা'টির মত সকল মানুষের ভিতরে একটি গণজাগরণ সৃষ্টি হতে পারে। অর্থ সংগ্রহের জন্য কমিটির কমিন্টমেন্ট থাকবে। এর চেয়ে সহজ পদ্ধতি আর কি হতে পারে? জীবনের সর্বস্তরে মাদরাসা শিক্ষাকে গ্রহনের জন্য সরকারি পৃষ্টপোষকতা ও নির্দেশের আবশ্যক রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম হল মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক' তা না হলে শিক্ষা বিনিময়ের পণ্য হয়ে দাড়ায়, তাতে প্রাণ থাকেনা, উদ্দেশ্য সাধন হয় না। দেশের মানুষ- যখন শিক্ষাকে নিয়ে সুচিন্তা এবং শিক্ষার সুবিন্যস্ত অবস্থায় বিচার বিবেচনা করতে শেখে। এ আশা তো শিক্ষকের কাছেই করব। কিন্তু শিক্ষক আমলা হয়ে গেলে বা আমলার দাস হয়ে গেলে তার কাছে করবনা।

হিংসা একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

অন্যের সুখ-সম্পদ দেখে মনে কষ্ট অনুভব করা এবং অন্যের সুখ-সম্পদ দুর হওয়ার কামনা করাকে হিংসা বলা হয়। হিংসা করা হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ আমার বান্দার সুখ-সম্পদ দেখে যাহাদের মনে কষ্ট হয়, তারা যেন আমার অনুগ্রহ বর্ষণের উপর অসন্তুষ্ট প্রকাশ করতেছে। রাসূলে মাকুল (সাঃ) ফরমিয়েছেনঃ অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে হিংসাও তেমনি নেকীসমূহকে ভস্মীভূত করে দেয়। তবে যারা খোদা প্রদত্ত মাল-দৌলত ও সম্পদকে অত্যাচার ও অনাচারে ব্যয় করে, এই রকম লোকদের সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করায় পাপ নেই। কারণ, এই স্থলে প্রকৃতপক্ষ সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করা হয় না; বরং উক্ত পাপকর্ম দূর হওয়ারই কামনা করা হয়। তথাপি কথা এই যে, এরূপ স্থলেও আপনার অন্তর পরীক্ষা করে দেখিতে হবে যে, সে ব্যক্তি সুপথে এসে সম্পদ ভোগ করলে তাতে আপনার মনে কোন শত্রুতা থাকবে কি না? যদি সে সুপথে আসলে তার সৌভাগ্য ও সম্পদভোগে আপনার মনে কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনার মন পবিত্র বলে বুঝতে হবে।

হিংসার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ-শত্রুতা। তা ছারা কোন কোন লোক মনের কার্পণ্য ও সঙ্কীর্নতার দরুণত পরশ্রীকাতর হয়ে থাকে। এ ধরনের লোকেরা কৃপণতা হেতু অন্যকে তো কিছু দিতে চায় না, আরো চায়- আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যেন অন্য কেউ না পায়।

গিবতাঃ অবশ্য অন্যের সুখ-সম্পদ, সম্মান ও উন্নতি দেখে নিজেও তদনুরূপ আকাঙ্খা করা যে, তার সম্পদ তার নিকট থাকুক, আমাকেও আল্লাহ্ তা'আলা তার মত সম্পদ, সম্মান ও উন্নতি দান করুন, এতে কোনই দোষ নেই। একে গিবতা বলে। গিবতার মধ্যে অন্যের উপর বৈরীভাব হয় না বলে এটা দোষণীয় নয়।

হিংসা দূর করার উপায়ঃ

হিংসা আত্মার রোগ। এর চিকিৎসা- পদ্ধতি দুইটিঃ মানসিক ও বাহ্যিক। মানসিক চিকিৎসা হল এই যে, মনে পরশ্রীকাতরতা উৎপন্ন হলে চিন্তা কবেনঃ আমি যে অন্যের সম্পদ দেখে মনে কষ্ট পাচ্ছি এতে ক্ষতি হচ্ছে কার? নিশ্চয়ই এতে আমার নিজেরই ক্ষতি হচ্ছে। যার প্রতি বৈরী-ভাব পোষণ করতেছি, তার তো কোনই ক্ষতি নেই; বরং তার উপকারই হচ্ছে। কারণ, আমার নেকীগুলো অনর্থক তার আমল-নামায় যাচ্ছে।

অথচ আমার ঐহিক ও পারত্রিক-উভয় দিক দিয়ে ক্ষতিই হচ্ছে। ধর্মের ক্ষতি তো এটাই যে, তিলেতিলে আমার নেকী লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। কারণ, আমি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে বৃথা কার্পণ্য ভাব পোষণ করে চাইতেছি-যেন খোদা-প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুর অংশ অন্য কেউ না পায়। ঐহিক ক্ষতি এই যে, পরশ্রীকাতর ব্যক্তি নিজের মনের আগুনে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরে। সর্বদাই কেবল এই চিন্তা অমুক ব্যক্তির ধন-সম্পদ যদি বিনষ্ট হত তার সম্মান প্রতিপত্তি যদি বিনাশ প্রাপ্ত হত ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার ভেবে দেখুন আপনার পরশ্রীকাতরতায় অপরের কি ক্ষতি হয়? কিছুই নয়,বরং তার আনন্দের বিষয় যে, আপনি তার অনিষ্ট চিন্তা করে সর্বদা কষ্ট পাচ্ছেন এবং আপনার নেকীগুলো সে অনায়াসে লাভ করতেছে। আশ্চর্যের বিষয়, পরের অনিষ্ট করতে গিয়ে আপনার নিজেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তা বুঝতে পারছেন না। পরের জন্য কূপ খুদে নিজেই তাতে পড়তেছেন। আপনার বোকামি ও দুরাবস্থা দেখে আপনার শত্রুরাও হাসতেছে।

বিশেষরূপে কোন আলেম অথবা ধর্মনিষ্ঠ ব্যাক্তির উপর যদি হিংসা করা হয় এবং তার ইল্‌ম ও পরহেযগারী দূর হওয়ার কামনা করা হয়,তবে তো আরও বেশী মারাত্মক কথা। এর পরিণাম হবে নিতান্ত শোচনীয়।

হিংসার বাহ্যিক চিকিৎসা এই যে, আপনার মনের বিপরীত আচরণ করবেন। আপনার মন অন্যের ছিদ্রান্বেষণ এবং অনিষ্ট কামনা করিতেছে; সুতরাং আপনি জোরপূর্বক মনের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যক্তির গুণ ও প্রশংসা বর্ণনা করুন। তাকে সম্মান করুন এবং তার সুখ-শান্তি ও সম্পদ দেখে কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করুন। কিছুদিন কৃত্রিমভাবে এরূপ আচরণ করলে পরে নিশ্চয়ই আপনার অন্তরে ক্রমশঃ তার প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসার উদ্রেক হবে। এই উপায়য়ে আপনার আত্মার হিংসা দূর হয়ে যাবে আশা করি।

দ্বিতীয় কথা, আপনার হিংসার কালকুট (বিষ) রয়েছে, বিবেক বুদ্ধিতে একে ঘ্যণা করতে হবে এবং ভাবতে হবে যে, এই রোগটি ইহজীবনেও যান্ত্রণাদায়ক, পরকালের পক্ষেও মারাত্মক। এর পরেও যদি খিয়ালে অনিষ্ট চিন্তা ভিতরে আসে তার ক্ষমতার বহির্ভূত। যা ক্ষমতার বাহিরের তাতে কোনই অপরাধ নেই। অবশ্য তৎসঙ্গে আপনার আত্মা যেন একে খারাব জানে। এর নিদর্শন এই যে, আপনার যদি উক্ত ব্যক্তিত সুখ-সম্পদ বা সম্মান দূর করার সামর্থ্য হয়,তবুও যেন কার্যত আপনি তার কোন চেষ্টা না করেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! মনে রাখবেন যার মন দুনিয়া হতে উঠে আল্লাহর সঙ্গে এবং পরকালের সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছে, সে স্পষ্ঠই বুঝতে পেরেছে যে, দুনিয়া ও অস্থায়ী এবং এর সুখ-সম্পদ ও অস্থায়ী সুতরাং ইহজীবনের সম্পদ দেখে হিংসায় কাতর হয়ে নিজের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ।

হযরত যুননূন মিছরীর (রঃ) মূল্যবান ৮টি উপদেশ

মাওঃ সুলেমান আহমদ (ইউ কে)

প্রিয় বৎসঃ আমি তোমাকে আটটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। এর মধ্যে চারটি করনীয় আর অন্য চারটি বর্জনীয় নিম্নেল্লেখিত আটটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমল করতে পারলে কিয়ামতের দিন তোমার অর্জিত ইল্ম তোমার বিরুদ্বে অভিযোগ-কারী হিসেবে দাঁড়াবেনা।

একঃ সচরাচর বহছ বিতর্কে অবতীর্ণ হইওনা, কারণ এতে সুফলের তুলনায় কুফল অর্থাৎ বিপদ ও গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। স্মরণ রেখো বহছ-বিতর্কের মাধ্যমে রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ দাম্ভিকতা, শত্রুতা প্রভৃতি বহুতর চারত্রিক দোষ জন্ম নেয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ মাসআ'লা সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তবে পরিশুদ্বাতার নিয়তে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করা দোষের কিছু নয়।

দুইঃ যথাসম্ভবঃ ওয়াজ নছিহত থেকে বিরত থেকো, যে পযর্ন্ত নিজে পরিপূর্ণ আমলে অভ্যাস্ত না হতে পার সে পযর্ন্ত অন্যকে উপদেশ দিওনা, যদি অগত্যা কোথায় ওয়াজ করতেই হয়। তবে দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো ও কল্পনার মাধ্যমে ভাষা চাতুর্যতা, কবিতা সুর এবং বানাউটি কথা-বার্তার জাল বুনে শ্রোতাগনকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করোনা। মনে রেখো এ ধরণের বাক্য বাগ্নীতা আল্লাহ পছন্দ করেননা। ওয়াজ করার সময় কোন অবস্থাতেই তোমরা অন্তরে যেন এমন কোন ইচ্ছা বাসা না বাধে যে, লোকেরা আমার ওয়াজ শ্রবণ করে চিৎকারর করুক, জামা-কাপড় ছিড়ে বুক চাপরে সভাস্থলে হৈ-চৈ করুক। যারা ওয়াজ করার সময় শ্রোতাগণের প্রশসংসার প্রত্যাশা করে তাদের অন্তর সাধারণতঃ আল্লাহর ভয় হতে শূণ্য থাকে।

তিনঃ জালেম ফাছেক, পাপাচারে অভ্যস্থ রাজা বাদশা এবং বড়লোকদের সহিত কদাচিৎ মিলা-মশা করো না এ সমস্ত লোকদের সালাম দিওনা, এদের প্রতি মুখ তুলে তাকাইওনা, কারণ এর দ্বারা আত্মার জগতে বিপর্যয়ের আশংকা রয়েছে। যদি ঘটনাচক্রে এ শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শ হয় তবে কোন অবস্থাতেই যেন তোমার মুখ হতে ওদের প্রতি কোন প্রশংসার ভাষা বের হয়ে না পড়ে। হাদীস শরীফে এসেছে কোন জালেম বা ফাছেকের তারিফ করা হলে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর গজব নাযিল হতে শুরু করে, কেহ যদি কোন জালেমের দীর্ঘায়ূর জন্য দোয়া করে তবে সে যেন প্রক্ষাত্ম রে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর গজব নাযিল হওয়াকেই পছন্দ করে।

চারঃ রাজা-বাদশা বা বড়লোকদের হাদিয়া কবুল করো না যদি জানা থাকে যে, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা হালাল রোজগার হতেই দেয়া হয়েছে, তথাপিওনা। কেননা বড়লোকের হাদিয়া তোহফা কবুল করার ফলে তোমার অন্তরে ধন সম্পদের প্রতি লালসা সৃষ্টি হতে শুরু করবে। আর ধন লিপ্সাই হচ্ছে সকল বিপর্যয়ের উৎসমূল।

পাঁচ। আল্লাহর সঙ্গে তুমি এমন সম্পের্ক রাখবে কোন অনুগত দাসের পক্ষে তার পক্ষে তার মনিবের সঙ্গে যেরূপ সম্পর্ক রাখা স্বাভাবিক। দাসের পক্ষে সব সময় স্বীয় মনিবের সন্তাষ্টি এবং আনুগত্যের প্রতি খেয়াল রাখা কর্তব্য। তেমনি ভাবে তুমিও সর্বদা সর্বাবস্থায় তোমার মালিক মাওলার সন্তুষ্টি অর্জনের সাধনায় নিয়োজিত থেকো। তোমার প্রত্যেক কাজ, এমনকি প্রতিটি অভিব্যক্তি যেন একমাত্র মাওলার প্রতিই নিবেদিত থাকে।

ছয়ঃ সৃষ্টি জীবরে সাথে বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে তোমাকে সেরূপ আচরণ করতে হবে যেরূপ আচরণ তুমি অন্য মানুষ হতে আশা করতে থাক, রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন, কোন লোকের ঈমান সে পযর্ন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে না যে পযর্ন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্য মানুষের জন্য তাই পছন্দ না করে।

সাতঃ সব সময়ই তোমাকে এলেম চর্চায় নিয়োজিত থাকতে হবে। তবে কি ধরণের এলেমের চর্চা করতে তো নির্বাচনা করার জন্য একটি বিষয়ে মনে রেখো মনে কর তুমি নিশ্চিতভাবে যদি জানতে পার যে, তোমার আয়ুর সীমা মাত্র আর এক সপ্তাহ এর বেশী সময় তোমার পক্ষে বাচার আর কোন আশা নেই তখন দর্শন, ব্যাকরণ, ন্যায় শাস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় বিষয়ের প্রতি তোমার মন কি আদৌ আকৃষ্ট হবে? না কেননা তুমি ভাল ভাবেই অনুভব করতে পার যে, মৃত্যুর উপরোক্ত শ্রেনীর জ্ঞান তোমার কোনই কাজে আসবেনা এ সময় বরং সেই ধরণের এলেমের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হবে যে এলেম তোমাকে মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তি সময়ে সাহায্য করতে পারে। এলেমই মৃত্যু তৎপরবর্তি সময় তোমার যথার্থ কাজে আসবে। সেই এলেমই তোমাকে দুনিয়ার দিক হতে পাক-পবিত্র করে আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত ও আনুগত্য শিক্ষা দিবে। তুমি যথাযথভাবে আল্লাহর এবাদতে আত্মানিয়োগ করার পথ খুঁজে পাবে।

আটঃ পরিবার পরিজনের বরণ পোষণের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখার চেষ্টা কর তবে বেশী জমা করার চেষ্ঠা করোনা, বড়জোর এক বৎসর ছলতে পারো এটুকু সঞ্চয় করাই যথেষ্ট স্বয়ং রাসূল (সাঃ) ও পরিবার পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করতেন।

অর্থাৎ ঃ আয় আল্লাহ মোহাম্মদের পরিবাররের জন্য শুধু চলারমত জীবিকা দিও, পরিবারের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) যেহেতু তাওয়াছলের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষে বেশী পূর্নতা অর্জন করতে সমর্থ হয়ে ছিলেন, এ জন্যই বোধ হয় তার ঘরে পূর্ণ এক দিনের খোরাক ও অনেক সময় থাকত না। আল্লাহ পাক আমাদের সকল উক্ত উপদেশ বাণীর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, এবং আমাদের সকল প্রকার খেদমত এবং শ্রম সাধনাকে কবুল করুন। আমীন!

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

আলিমা বুশরা আহমাদ (ইউ কে)

নারীর যথার্থ মর্যাদা এবং যথার্থ অধিকার দিয়েছে একমাত্র ইসলাম অর্থাৎ কুরআনুল কারীম। কুরআন ছাড়া নারীর মর্যাদা ও অধিকার আর কেউ দিতে পারেনি, বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান স্বেচ্ছায় কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআন নারী জাতিকে কি মর্যাদা ও কি অধিকার দিয়েছে তা অধিকাংশ মুসলমান জানেনা। কেন জানেনা? তারা মুলসমান হয়ে কুরআনের ধর্মের বিশ্বাসী হয়েও বিভিন্ন ধরণের তুচ্ছ স্বার্থের মোহ পড়ে কুরআন এর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ ত'য়ালা নারী জাতিকে কেন সৃষ্টি করলেন এর কারণ তিনি ইরশাদ করেন- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (روم : ٢١)

এই আয়াতে নারী জাতিকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, যাতে পুরুষ জাতি তাদের কাছে পৌঁছে সুখ শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে, আর সুখ শান্তি তখনই লাভ করা যায়, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও সচেতন থাকবে এবং তা আদায় করে দেবে। প্রতিটি মানুষকে তার স্তর অনুযায়ী অধিকার মর্যাদা দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। চাই সে শিশু, কিশোর, কিশোরী, শ্রমিক, রাজা-বাদশাহ হোক। তেমনি ভাবে ইসলাম নারীকে তার অবস্থানের ভিন্নতার ক্রমধারার উপযুক্ত অধিকার দিয়ে তাদেরকে করেছে সম্মানের আসনে অসীম। ইসলাম পূর্ব যুগে নারীকে অবহেলিত জাতি মনে করত। নারীরা ছিল সর্বদিক দিয়ে উপেক্ষিত, নারীর প্রতি তাদের হিংস্রতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, তারা কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত। এবং তাতে দ্বিধাবোধ করতো না। ইসলাম যে নারীর অধিকার দিয়েছে তা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন- اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

অন্য হাদিসে আছে اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ |
তাছাড়া আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেন- هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

এগুলো ইসলাম যে নারীদের অধিকার দিয়েছে এর জলন্ত প্রমাণ।

অন্যান্য ধর্ম যেখানে নারীকে সকল পাপের উৎস এবং শয়তানের প্রবেশদ্বার বলা হয়েছে- সেখানে ইসলাম নারীকে অমূল্য সম্পদ পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী পুরুষের ভূষন। ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করেছ। ইসলাম যেমন পুরুষদেরকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছে তেমনি নারীদেরকে দিয়েছে। যার প্রমাণ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

তাছাড়া আমরা দেখতে পাই ইসলামের প্রথম

শিক্ষাগ্রহণকারী নারী ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)। এমনিভাবে রাসূলে কারিম (সাঃ) এর তিরোধানের পর বিশ্বের বুকে মহান শিক্ষিকা হিসেবে অমরকীর্তি রেখে গেছেন হযরত আয়শা (রাঃ)। ইসলাম নারীদেরকে পর্দা নামক আবরণী দ্বারা তাদের সম্মান ইজ্জতকে হেফাজত করেছে। পর্দার বিধান দিয়ে ইসলাম নারীদের যিনা, ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেছে। ইসলাম নারীদের যেমন-পিতার সম্পত্তির অধিকারী করেছে। অথবা নারীদের জিম্মায় কোন খরচ নেই। পক্ষান্তরে পুরুষরা নিজের খরচের পাশাপশি পরিবারের দায়িত্ব আদায় করে। নারীদের বিবাহের পূর্বের খরচের ভার থাকে তার পিতার উপর। কিন্তু ছেলেরা সাবালক হওয়ার পর বাবার পক্ষ থেকে ভরণপোষণের অধিকার হারায়। নারীর বিবাহেরে পর ভরনপোষণের দায়িত্ব থাবে স্বামীর উপর। ইসলাম বিবাহের বেলায়/কন্যার পিতার উপরকোন খরচের জিম্মা দেয় নি; বরং সব খরচের দায়িত্ব ছেলের উপর। এমনকি বিবাহ করতে আসলে মেয়ের পোষাক নিয়ে এসে মেয়েকে সজ্জিত করে নিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া নারীদের সম্মানের জন্য মোহরের বিধান ধার্য্য হয়েছে। কুরআনের বলা হয়েছে-

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

বর্তমান যুগে নামধারী প্রগতিবাদী লোক নারী স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের সমান অধিকার নামের মনকাড়া শ্লোগান দিচ্ছে অথচ অধিকার বলতে কি বোঝায়, এটা তাদের বোধগম্য নয়। ফলে নারীকে অধিকার দিচ্ছে না। বরং অধিকারকে হরণ করে ঢেলে নিচ্ছে অশান্তিতে জাহান্নামে। নারীদেরকে বিভিন্ন কর্মস্থলে নামিয়ে সমান অধিকার দিচ্ছে। অথবা ইসলাম নারীকে দায়িত্ব দিয়েছে ঘরের পারিবারিক কাজ কর্মের। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِه.

বর্তমান প্রগতিবাদীরা নারী স্বাধীনতার শ্লোগান দিচ্ছে-

'চল সবাই এগিয়ে যাই
নারী পুরুষ ভেদাভেদ নাই'

নারী ও পুরুষে যদি সত্যিই কোন ভেদাভেদ না থাকে, তাহলে নারী-পুরুষ পৃথক নাম কেন? নারী পুরুষ এখনও সমান হতে পারে না, এবং কখনো পারবেনা।

সুতরাং হে মুসলিম দ্বীন দরদী মা-বোনেরা! আপনারা ইসলামের পদ ও অধিকার মেনে নিয়ে যথার্থ অধিকার লাভ করুন। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন আমিন'।

তালিবে ইলমদের প্রতি অমূল্য উপদেশ

নাসরিন বিনতে শায়খ আবু তাহের ফারুক্বী [ইউ কে]

তালিবে ইলমদের প্রতি হযরত থানভীন রহ. এর অমূল্য উপদেশ। ছাত্র জীবনে স্বাস্থ্য সুস্থতা ও অবসর সময়কে গণীমত মনেকরে মূল্যায়ন কর। সকল ছাত্রদের বিশেষ করে দ্বীনি ইলম আহরণ কারীদের সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে বেচে থাকা একান্ত অপরিহার্য। বিশেষত কামভাবের গোনাহ থেকে। কেননা পাপের দরুন শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ করে মন মস্তিস্ক দূর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ইলম অর্জনে ব্যাঘাত ঘটে। অন্য ছাত্র/ছাত্রীদের মেধা ও স্বরণ শক্তি নিয়ে কখনো হিংসা করবে না, এতে তোমার কোনো ফায়দাতো হবেই না বরং উল্টো তুমার ক্ষতি হবে। সর্বদা পেরেশানীর গ্লানী বোঝা হয়ে থাকবে। মন বিক্ষপ্ত থাকবে, ফলে লেখা-পড়ায় মন বসবেনা। এ ছাড়া হিংসার কারনে নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়। যদি কেউ তোমাকে উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলেন, তা হলে তার আলোচনা শেষ হওয়ার পূর্বে সেখান থেকে উঠবে না। এতে আলোচনার অবমূল্যায়ন হয় এবং আলোচক মনে কষ্ট পান। তোমার সহপাঠি বা অন্য কেউ যদি পড়া বা লেখার ভুল করে তাহলে তুমি এতে হাসবে না, এতে জগন্যতম দুটি অপরাধ হবে। এক- তোমার অহংকার প্রকাশ পাবে। দুই- তোমার এক মুসলমান ভাই অন্তরে আঘাত পাবে। আর এ উভয়টি হারাম। কিতাব বা বইপত্র অত্যন্ত আদরের সাথে ধরবে। সাবধান, পা যেন কখনো কিতাবে না লাগে। কিতাবের ইবারত বা রিডিং বিশুদ্ধভাবে পড়ার চেষ্টা করবে। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন-উত্তরের পিছনে পড়ে মূল কথা হাতছাড়া করবে না। পড়া ভালোভাবে মুখস্ত করবে। যাতে অন্তরে দৃঢ় ভাবে বসে যায়। কোনরকম মুখস্ত করে উস্তাদদেরকে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করবে না। এরকম মুখস্ত বেশি-দিন থাকে না। ক্লাস চলাকালীন উস্তাদদের সামনে হাসাহাসি বা এমন কোন আচরণ করিবে না যাতে উস্তাদদেরন মনে আঘাত লাগে। ইলম নিয়ে কখনো গর্ব করবে না। বরং আল্লাহর নেয়ামত মনে করে শুকরিয়া আদায় করবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখবে। এতে সমস্ত জিনিস তোমার অনুকূলে চলে যাবে। আল্লাহ তা'য়লা আমাদের সবাইকে উপরোক্ত উপদেশ গুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দোয়ার ফজীলত

মাওলানা মুজাম্মিল হক বাহুবলী

নাজিমে তালিমাত, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي- أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

অর্থঃ- আর তোমাদের রব বলছেন- ‘তোমরা আমার নিকট দোয়া করো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব বা দোয়া কবুল করব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার দেখায় তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ (সুরা মুমিন)

দোয়া একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। কেননা তাতে আল্লাহর দিকে পূর্ন মনোনিবেশ একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর সামনে হাত তোলা, ক্রন্দন করা হয়। তাতে পরিপূর্ন গোলামী প্রকাশ হয়। এজন্যই প্রতিটি ইবাদতে রয়েছে দোয়া

তাই উক্ত আয়াতে ইবাদাত এবং দোয়া থেকে বিমুখ হওয়াকে ইবাদাত বিমূখ হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে রাসুল (সা.) বলেছেন-

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির জন্য দোয়ার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ দোয়া করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। যত দোয়া করা হয় তার মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় দোয়া হল তার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তার দোয়া করা।’ (মেশকাত শরীফ)

কানজুল উম্মাল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে রাসুল (সা.) বলেছেন- দোয়া ছাড়া অন্য কোন কিছু ভাগ্য লিপিকে বা বিপদকে প্রতিহত করতে পারে না। আর নেক কাজ ব্যতিত অন্য কোন কিছু আয়ু/হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে না। বিপদ বা ভাগ্যলিপি প্রতিহত করার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তায়ালার ইলমে পূর্ব থেকেই স্থির করা থাকে যে এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করবে এবং এই বিপদ থেকে সে বেঁচে যাবে। এমনই ভাবে আল্লাহর নিকট এটা ফায়সলা করা থাকে যে এই লোকের আয়ু বা বয়স ষাট বছর কিন্তু সে হজ্ব করবে না আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এই জন্য তার আয়ু/হায়াত বিশ বছর বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। সে আশি বছর দুনিয়াতে বাঁচবে। হাদীসে আছে-

অর্থাৎ দোয়া ও আল্লাহ তায়ালার নিকট নির্ধারিত থাকে। রাসুল (সা.) বলেছেন- ‘আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ন অন্য কিছু নাই।’ (তিরমিজি শরীফ)

এজন্য যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দোয়া থেকে বিরত থাকার দ্বারা অহংকার প্রকাশ প্রায় যা আল্লাহ তালার নিকট মারাত্মক অসন্তুষ্টির কারণ। অপরদিকে দোয়া করা সরাসরি গোলামীর প্রকাশ পায়, যা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

যেমনটি উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস দ্বারা বুঝা যায়।

কানপুল উম্মাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) বলেছেন- مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ غَضِبَ عَلَيْهِ

'যে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন।' রাসুল (স.) আরো বলেছেন- 'যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ তালা যেন বিপদে আপদে তার দোয়া কবুল করেন, সে যেন ভাল থাকা অবস্থায় ও অধিক পরিমাণে দোয়া করে।' (তিরমিজি শরীফ)

রাসুল সা. বলেছেন দোয়া হল দ্বীনের খুঁটি এবং আসমান ও জমিনের নূর (হাকেম)

বিপদ আপদ থেকে বাঁচার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হল দোয়া। তাই দোয়া হল মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের খুঁটি হল নামাজ আর নামাজের রুহ হলো একাগ্রতা যা দোয়ার বৈশিষ্ট। তাই দোয়া ও দ্বীনের খুঁটি। অনুরুপভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক পরিমানে দোয়া করা ও তার একত্তবাদের ঘোষণার বিশেষ রুপ। এই সেই নূর যার আলোতে আসমান জমিন আলোকিত এবং স্থির রয়েছে। হাদিসে এসেছে- কেয়ামত তখন পর্যন্ত হবে, যখন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার যত কেউ থাকবে না তাই দোয়া হল আসমান জমিনের নূর।

রাসুল (সা.) বলেছেন যখনই কোন মুসলমান কিছু চাওয়ার জন্য আল্লাহ তালার দিকে নিজের চেহারা উর্ধ্বমূখী করে (এবং দোয়া করে আল্লাহ তায়ালা তাকে ঐ বস্তু অবশ্যই দান করেন। হয়ত ঐ বস্তুটি তাকে নগদ দেন অথবা দুনিয়া আখেরাতের জন্য জমা রেখে দেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়া কবুলের ৩টি সুরত রয়েছেঃ- ১। আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানে যদি বান্দার জন্য তা কল্যাণকর হয় তা হলে নগদে উদ্দেশ্য পূরণ করে দেন। ২। যদি নগদ উদ্দেশ্য পূরণ করা বান্দার জন্য কল্যানকর না হয় তা হলে উপযুক্ত সময়ে তার উদ্দেশ্য পূরণ করেন। ৩। নতুবা দুনিয়াতে বা আখেরাতে তার উত্তম বদলা দান করেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করার প্রতিদান সর্বাবস্থায় সে পেয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল দোয়া কখনও বিফলে যায় না।

যাদের দোয়া দ্রুত আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হয়।

১। অসহায় নিরুপায় লোকের দোয়া

২। নির্যাতিত মানুষের দোয়া, যদিও সে গোন-াগার হয়।

৩। সন্তানের জন্য পিতার দোয়া।

৪। ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া।

৫। নেককার সৎ বান্দার দোয়া।

৬। পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরন কারী এবং তাদের খেদমতকারী ঐ সন্তানের দোয়া।

৭। মুসাফিরের দোয়া।

৮। ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া।

৯।অজান্তে কোন মুসলিমদের জন্য অপর মুসলমানের দোয়া।

১০। প্রত্যেক মুসলমানের দোয়া যতক্ষণ সে কারও প্রতি অন্যায় বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দোয়া না করে। দোয়া করার পর হতাশ বা অভিযোগের স্বরে এ কথা না বলে যে দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয়নি বা আল্লাহ আমার ডাক শুনেন নি।

১১। জামে আবু মানসুরের বর্ণনায় আছে হাজ্বিদের দোয়া যতক্ষন সে হজ থেকে ঘরে না ফিরে আসে। অতএব আসুন দোয়াকে আমরা নিজসঙ্গী বানিয়ে নেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

দুনিয়া পরিক্ষার হল

মাওলানা আল-আমিন রাজনগরী
সহকারী নাজিম, জমেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা

এই দুনিয়াটা হল একটি পরিক্ষার হল। আর জগতের যাবতীয় নারী পুরুষ সকলেই হল পরীক্ষার্থী। স্বয়ং আল্লাহ পাক হলেন পরীক্ষক, আর মানুষের জীবন হল পরীক্ষার জীবন। যেমনি ভাবে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি ও মাদ্রসার পরিক্ষা সমুহে পরীক্ষার্থীগন হলে প্রবেশ করার পরপরই তাদের হাতে প্রশ্ন পত্র দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি ভাবে জগতের প্রতিটি নরনারী প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পরপরই আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কর্তৃক শরীয়তের বিধান পত্র তাদের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

সুতরাং যারা শরীয়তের পক্ষ থেকে অর্পিত করণীয় বিধান সমুহ যথাঃ- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মুআক্বাদাহ, পুরোপুরি আদায় করবে এবং বর্জনীয় বিষয় সমূহ পুরোপুরী বর্জন করে যেতে পারবে অর্থাৎ জায়েজ নাজায়েজ ও হালাল-হারাম তারতম্য করে জীবন কাটাবে, তারাই পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ বলে সাব্যস্থ হবে। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির পরীক্ষা সাময়িক। তার জন্য সুনির্ধারিত সময় রয়েছে। কিন্তু সময় শেষ হলে পরবর্তী বছর আবারও ভালো করে পরীক্ষা দেওয়ার অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে মানুষের জীবন পরীক্ষা, এ পরীক্ষার সময় একবার শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় এসে আবার ভাল করে পরীক্ষা দেয়া তথা আমল করার অবকাশ থাকবে না। কেননা দুনিয়ার হায়াত একবার ফুরিয়ে গেলে দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না। তাই আমল যা করবে মউতের আগে করে যেতে হবে। মউতের পর আর আমল করার সুযোগ থাকবেনা।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, আমাদের জীবন পরীক্ষা। আমলের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা যখনই কোন আমল করি সাথে সাথে ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করে। এই আমল হয়তো প্রশ্নপত্রের স্বপক্ষে হবে অথবা বিপক্ষে। যদি স্বপক্ষে হয় তাহলে তার যথাযথ পুরস্কার পাওয়া যাবে। আর যদি বিপক্ষে হয় তাহলে তার পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করতে হবে। ভালো-মন্দ কোন আমলই আল্লাহ পাক এমনিই ছেড়ে দিবেন না। এজন্যই রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ-

الَّـذِي خَلَـقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ لِيَبْلُوَكُـمْ أَيُّـكُمْ أَحْـسَنُ عَمَلًا.

অর্থঃ ‘যিনি (তোমাদের) মউত ও হায়াতকে সৃষ্টি করেছেন (একথা) পরিক্ষা করার জন্য যে, তোমদের মধ্যে কর্মগত দিক থেকে কে উত্তম’ (সূরা মুলক/২)। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জীবন আর মরনের উদ্দেশ্যই হলো এ কথা পরীক্ষা করা যে, কে আল্লাহ কর্তৃক শরীয়তের বিধি বিধান মেনে চলে? আর কে এগুলো উপেক্ষা করে?!

এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, আল্লাহ পাক বলেন- আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কে কর্মগত দিক থেকে উত্তম। 'কার কর্ম কত বেশী?' -এ কথা বলেন নি। এ থেকে বুঝা যায়- কারও কর্ম কম-বেশী হওয়া আল্লাহ পাকের নিকট আকর্ষনীয় ব্যাপার নয় বরং কর্মটি ভালো নির্ভুল ও খালেছ হওয়াই কাম্য। এ কারণেই তো কেয়ামতের দিন আমলনামা গণনা করা হবে না বরং ওজন দেয়া হবে। এতে দেখা যাবে যে, কোনো একটি কর্মের ওজন অন্য হাজারও কর্ম অপেক্ষা ভারী হবে।

মানুষের পরীক্ষা তথা আমলের পরিপূর্ণ ফলাফল বা রেজাল্ট যদিও ঘোষণা করা হবে হাশরের ময়দানে, কিন্তু এই ফলাফলেরই পুরস্কার বা শাস্তির নমুনা ভোগ শুরু হবে কবরের জীবন থেকেই। যেমন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন-

اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ

অর্থঃ কবর হল বেহেশতরে বাগিচা সমূহ থেকে একটি বাগিছা অথবা দোযখের গর্ত সমূহ থেকে একটি গর্ত। কারণ কবরই হলো আখেরাতের সর্বপ্রথম ঘাটি এবং কবরেই হিসাব নিকাশের চুড়ান্ত ফায়ছালা ঘোষণা করা হবে। হাশরের ময়দানে করণীয় কাজ গুলো রীতিমত করে যেতে পারলে আল্লাহ পাক অবশ্যই চিরস্থায়ী বেহেশতের মালিক বানিয়ে দিবেন। নতুবা সমস্ত উম্মতের সামনে চরম অপরাধি বলে অভিযুক্ত করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। তাই কবি আমাদের সর্তক করেছেন-

"হে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তুমি গাফেল উদাসীন হয়ে থেকো না (এ দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়)।"

তোমাকে একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। অতঃপর জান্নাত অথবা জাহান্নামকে আপন ঠিকানা বানাতে হবে। অতএব অসচেতন হয়ে দুনিয়ার জীবন নষ্ট না করে বরং সৎ কর্মের প্রতি সচেতন হও।

কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেদিন বিচারক হয়ে বসবেন সেদিন তোমাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে কড়ায়-গন্ডায় হিসাব দিতে হবে। হাশরের ময়দানে এমন একটি পর্যায় আসবে যে, যখন মানুষ উপায় না দেখে অনেক গুনাহ অস্বীকার করার চেষ্ঠা করবে। তখন আল্লাহ পাক আপন কুদরতে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বাক শক্তি দান করবেন। ফলে অঙ্গ পত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে শুরু করবে।

পরীক্ষা তিন প্রকারঃ

মানুষ ঈমানদার বলে দাবী করার পর আল্লাহ পাক তার থেকে তিন ভাবে পরিক্ষা নিয়ে থাকেন। (এক) আল্লাহপাকের বিধি-নিষেধ পালনের মধ্যমে, (দুই) অসুখ-বিসুখ ও মুছিবতের দ্বারা এবং (তিন) কাফের তথা ইসলামের শত্রুদের তরফ থেকে নির্যাতন- নিপীড়নের মাধ্যমে। প্রথম প্রকার পরিক্ষা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার পরীক্ষা থেকে তুলনা মূলক খুবই সহজ। শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করে বৎসরে একমাস রোজা রেখে, জায়েজ-নাজায়েয, হালাল-হারাম পার্থক্য করে চলতে পারলেই পরিক্ষায় পাশ। আর মাল থাকলে যাকাত অথবা হজ্বের প্রশ্ন, নতুবা প্রয়োজন নেই। এরপর পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার পরিক্ষা খুব কঠিন। আল্লাহ পাক যাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার ও বেহেশতের উচ্চাসনে সমাসীন করার ইচ্ছা করেন, তাদেরকেই এই দুই প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন করে থাকেন। এই দুই প্রকার পরীক্ষায় যারা যত বেশী ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে এবং সবর অবলম্বন করতে পরবে তাদের মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পাবে।

কোরআনের পরিচয়

হাফেজ ক্বারী আবু বকর সিদ্দীক
হিফজ প্রধান শিক্ষক জামেয়া ফারুকীয় তাজপুর মাদ্রাসা

কোরআন আল্লাহর নাযিলকৃত ঐ কিতাবকে বলে, যা তিনি তার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপরে দীর্ঘ তেইশ বছর কালব্যপী বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজন মোতাবেক অল্প অল্প করে অবর্তীণ করেছিলেন। ভাষা এবং ভাব উভয় দিক হতেই কোরআন আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআনের ভাব (অর্থ) যেমন আল্লাহর তরফ থেকে আগত, তেমনি তার ভাষাও।

কোরআন নাযিলের কারণঃ

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল বক্ষনের পরে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) কে বেহেশত হতে দুনিয়ার পাঠানোর প্রাক্কালে আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছিলেন যে-

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (৩৮) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

‘তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে পড়। অতঃপর তোমাদের কাছে আমার হতে জীবন বিধান যেতে থাকবে, পরন্ত যারা আমার জীবন বিধান মেনে চলবে, তাদের ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সম্পত্তিতে তারা আবার অনন্ত সুখের আধার এ বেহেশতেই ফিরে আসবে। আর যারা তা অস্বীকার করে আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা সাবস্ত করবে, তারা হবে জাহান্নামীদের অধিবাসী এবং সেখানে তারা অনন্ত কাল থাকবে। (সূরা বাকারা, আয়াত নং ৩৮-৩৯)’ আল্লাহ তায়ালার উক্ত ঘোষনা মোতাবেকেই যোগে যোগে আদম সন্ততির কাছে আল্লাহর তরফ থেকে হেদায়ের বা জীবন বিধান এসেছে, তাই এই জীবন বিধানেরই অন্য নাম কিতাবুল্লাহ। যখন কোন মানব গোষ্ঠী আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে নিজেদের মনগরা ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে, তখনই কিতাব নাযিল করে মানুষের সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

কিতাব নাযিলের ব্যপারে আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন নীতি হল এই যে- তিনি যখন কোন জাতির উপর কিতাব নাযিলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তখন সেই জাতির মাধ্যম থেকে মানবীয় গুণের অধিকারী লোকটিকে পয়গম্বর হিসেবে বাছাই করে নেন, অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তাহার উপরে কিতাব নাযিল করে থাকেন। মানব সৃষ্টির সুচনা হতে দুনিয়ায় যেমন অসংখ্য অগণিত নবী রাসূল এসেছেন, তেমনি তাহাদের উপর নাজিল কৃত কিতাবের সংখ্যাও অগণিত। নবীদের মধ্যে যেমন হযরত মোহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী, তেমনি তাহার উপর নাযিল কৃত কিতাব ও আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। অতপর দুনিয়ায় আর কোন নতুন নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটিবে না, আর কোন আসমানি কিতাবও অবতীর্ণ হবে না।

কোরআনে আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্যঃ

কোরআনের আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতি। কেননা মানব জাতিকে প্রকৃত কল্যান ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয় কোরআনে দান করা হয়েছে। কোরআনের উদ্দেশ্য হল মানব জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার পথ প্রদর্শন, যাতে দুনিয়াতেও জীবন কল্যানময় করতে পারে এবং পরকালে ও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

সন্তানের জন্য পিতামাতার করণীয়

হাফেজ সাইফুল ইসলাম
শিক্ষক, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

সু-সন্তানের জন্য একজন সুন্দর মায়ের প্রয়োজন অর্থাৎ ভদ্র ও নেককার নারীকে বিবাহ করা । তাহলে তার গর্ভে সু-সন্তানের আশা করা যায়। কেননা সন্ত গান গর্ভে থাকা অবস্থাতেই মাতার চিন্তা ভাবনা, মন মানসিকতা ও স্বভাব চরিত্রের প্রভাব সন্তানের উপর পড়াটাই স্বাভাবিক । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন তাঁর মায়ের কোরআন শরীফ মুখস্ত ছিল। যার প্রভাব আব্দুল কাদির জিলানীর উপর পড়েছিল তাই তিনিও ১৮ পাড়া হাফেজ ছিলেন । আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর মাতা বলেন যদি সম্পুর্ণ কোরআন শরীফ মুখস্ত থাকত তাহলে আমার ছেলেও সম্পুর্ণ কোরআন শরীফের হাফেয হয়ে জন্ম নিত ।

সু-সন্তানের জীবন রক্ষা করাঃ- ইসলাম জাহিলী যুগের সন্তান হত্যা করার প্রথাকে হারাম ঘোষণা করেছে । তাই ইসলাম পরবর্তী যুগে ছেলে হউক বা মেয়ে হউক কাউকে হত্যা করা এবং জীবন্ত কবর দেয়ার মত গর্হিত কার্যকলাপকে নিষেধ করেছে। যার দরুন সন্তান হত্যার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ।

সন্তানকে লালন পালন করাঃ- মাতার জন্য সন্তানকে দুধ পান করানো ওয়াজিব করা হয়েছে মাতার অবর্তমানে বা অপারগতার কারণে দুধ মাতার মাধ্যমে দুধ পান করানো হলে তার ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের পিতার উপর ওয়াজিব । উল্লেখ্য যে, দুধ মাতা নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার মহিলাকে নির্বাচিত করা কর্তব্য। কারণ বাচ্চার চরিত্রে দুধের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। এমনিভাবে সন্তানের লালন পালন হালাল সম্পদ দ্বারা হওয়া চাই । নতুবা সন্তান বড় হওয়ার পর তার মধ্যে হালাল হারামের পার্থক্য করতে পারবে না ।

আদর ও সোহাগঃ- সন্তানকে আদর ও সোহাগের সহিত বাচ্চাকে লালন পালন করা কর্তব্য। কেননা আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত বাচ্চাদের মনমানসিকতা বিকৃত হয়ে যেতে পারে। তাই যথাসম্ভব আদর সোহাগ দিয়ে বাচ্চাকে লালন পালন করতে হবে। আদর করে ছেলেকে আব্বু ডাকা ও মেয়েকে আম্মু বলা যেতে পারে । এতে কোন ক্ষতি নেই। তবে আদর সোহাগ করে নাম বিকৃত করে ডাকা ঠিক নয় ।

সন্তানের ভাল নাম রাখা মাতা পিতার দায়িত্ব

এবং এটা সন্তানের অধিকার এর দ্বারা বরকত হাসিল হয়। জন্মের সপ্তম দিবসে সন্তানের নাম রাখা মোস্তাহাব । নামের ক্ষেত্রে ভাল অর্থপূর্ণ নাম রাখা উচিত। কারণ নামের অর্থের প্রভাবও তার উপর পড়তে পারে। সবচেয়ে উত্তম নাম আব্দুল্লাহ ও তারপর আব্দুর রহমান । যেসকল নামের শুরুতে আব্দ এবং শেষে আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহের যেকোন একটি রাখা উত্তম। ছেলেদের নাম আম্বিয়া, সাহাবা, অলি আউলিয়াদের নামের অনুরূপ রাখা উচিত । মেয়েদের নাম হুজুর (সাঃ) স্ত্রী, হুজুর (সাঃ) এর কন্যা অথবা অন্যান্য নেককার মহিলাদের নামের অনুরূপ রাখা ভাল । কারো নাম অপছন্দনীয় হলে তার নামও পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখতে পারবে। তা রাসুল (সাঃ) করতেন। একাধিক নাম রাখা জায়েয তবে ভাল নামটি কাগজে কলমে রেখে অর্থহীন অন্য একটি ডাক নাম রেখে সেই নামে ডাকার যে প্রচলন আজকাল সমাজে দেখা যায় তা ঠিক নয় । একাধিক নাম রাখলে প্রত্যেকটি নামই ভাল হওয়া উচিত ।

সু-শিক্ষা প্রদানঃ- মুসলমানের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সন্তান ছেলে হউক বা মেয়ে হউক তার ডান কানে আজান বাম কানে একামতের শব্দগুলো শোনানো সুন্নাত । কারণ এ শব্দগুলোর একটা সুপ্রভাব তার মধ্যে পড়বে । সন্তানকে সর্বপ্রথম যে কথাটি শিখানো উচিত তা হলো লা ইলাহা ইল্লাহ । কথা বলার শেখার পরই সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেয়া এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া কর্তব্য। যাতে সন্তান শিশুকাল থেকেই কথাবার্তা চলাফেরা উঠাবসা খাওয়া ধাওয়া সালাম কালাম আদব কায়দা মত গড়ে উঠে ।

কত বয়স থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়া শুরু করতে হবে এ ব্যাপারে কুরআন হাদীস থেকে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না । সাত বছর বয়স থেকেই সন্তানকে নামাজ পড়তে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। তাই হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য অর্থাৎ নামাজের জন্য যখন সাত বছর বয়সকে নির্ধারন করা হয়েছে সে অনুযায়ী আমার মনে হয় এ বয়সটাই নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া শুরু করানোর উপযুক্ত সময়।

এ সময় মক্তবে, মাদ্রাসা ও স্কুলে পড়ানো উচিত সে প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত হয় কিনা তা খেয়াল রাখা অন্যথায় সে মাদ্রাসা স্কুলের কথা বলে বাজে ছেলেদের সাথে সারাদিন খেলাধুলায় থাকবে । এজন্য সন্তান কোথায় গেল কি করল এ সমস্তের উপর দৃষ্টিপাত করা পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানঃ বর্তমান যুগের পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞান যেমন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, প্রকৌশল, অর্থ, রাষ্ট্র, কৃষি, বিদ্যুৎ, ভুতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা করা ইসলাম ও মানবকল্যাণের স্বার্থে অবশ্যই প্রয়োজন । এছাড়া দুনিয়াবী স্বার্থে কল্যাণ আসতে পারে না । ইংরেজি পড়বে না কেন? এই ভিত্তিতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র:) লিখেছেন যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে সততা সহকারে মানবসমাজের সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে রাস্তা ব্রীজ ঘর বাড়ি তৈরি করে মানুষের উপকার করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করে মানুষের সেবা করতে পারে তাহলে তা উচ্চস্তরের নেকীর কাজ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । পক্ষান্তরে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ধোকাবাজি করে ব্লাক মার্কেটিং করে আমানতের খিয়ানত করে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখে গরীব রোগীদের টাকা না থাকার কারণে দুব্যবহার করে আধুনিক যুগে আবিস্কৃত মেশিন দ্বারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে অর্থ শোষন করে তাদেরকে কংকালসার করে তবে সেটা কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে হারাম।

ইনসাফ রক্ষা করাঃ- সন্তানদেরকে ধন সম্পদ দান প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ভাল । তবে কোন সন্তান তালিবে ইলম হলে সে যেহেতু দ্বীনের কাজে নিয়োজিত থাকার দরুন, জীবিকা উপার্জনে স্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে থাকবে তাই থাকে কিছু বেশি দান করে গেলে কোন অন্যায় হবে না । এমনিভাবে কোন সন্তানকে রোগের কারণে বা স্বাস্থ্যগত কারণে উপার্জন করতে অপারগ হলে তাকেও কিছু বেশি দেয়াও যেতে পারে ।

উস্তাদের মানসিক বিশ্রামের ছয়টি পদ্ধতিঃ

হাফেজ আজিজুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

ক্লান্তি মানুষকে সময়ের পূর্বে বৃদ্ধ করে দেয়, মাথা হতে দুশ্চিন্তা মুছে ফেলার জন্য জরুরী হচ্ছে বিশ্রাম নেয়া। বিশ্বের সকল বিশ্লেষক ও বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে বিশ্রাম সাফল্যের উপকরণ। মুস্তকের ক্লান্তি ও মানসিক চাপ এমন জিনিস যা অত্যন্ত সুর্দশন চেহারাকেও বিকৃত করে দেয়। ফুলকে যদি আগুনের কাছে রেখে দেয়া হয় তাহলে তা কিছুক্ষণ পরই ঢলে যায়। বলা হয়ে থাকে দুঃখ ও পেরেশানীর কথা কারো নিকট বর্ণনা করলে কিছুটা হালকা হয়। যদি আপনারা নিম্নোক্ত ৬টি বিষয়ের উপর অভ্যস্ত হতে পারেন,তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনারা স্নায়ুবিক দুবর্লতা ও সকল রকমের দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা পেতে পারেন।

এশার নামাযের পর পরই ফাতেমী তাসবী ও সূরা সুলক পাঠ করে ঘুমিয়ে যাবেন এবং ফজরের নামাজের পূর্বে ঘুম থেকে জাগ্রত হবেন। সমস্ত ইউনানী হাকীম ডাক্তারগন এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের আড়াই ঘন্টা পর ঘুমিয়ে যাবেন ও সূর্যদয়ের আড়াই ঘণ্টা পূর্বেজাগ্রত হবে, তার স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকবে। মাথা, চোখ, কান ইত্যাদি শেষ বয়স পযর্ন্ত সক্রিয় থাকবে। আর এটা মানুষের চাক্ষুষ প্রমান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, রাত্রের প্রথম-াংশের কয়েক ঘন্টা ঘুম যে প্রশান্তি দান করে, দিনের দীর্ঘ সময়ের ঘুমও সেই প্রশান্তি দেয় না। রাতের আগমন ঘটলে কুদরতী ভাবে আবহাওয়-ার মধ্যে এমন একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যাতে প্রত্যেকটা বিচরণশীল প্রানীও পাখির ঘুম এসে যায়। আল্লাহর বানী অনুসারে- هُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ اللَّيْـلَ لِتَسْـكُنُوا فِيـهِ. আল্লাহপাক রাতকে বানিয়েছেন এ জন্য যেন এর মধ্যে প্রশান্তি লাভ করা যায়। তাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাত জাগা প্রকৃতির পরিপন্থী। যে ব্যক্তি প্রকৃতির পরিপন্থী কাজ করে এর ফলাফল দেরিতে হলেও অবশ্যই ভোগ করে থাকে। তার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবনশক্তি লোপ পায়। তেমনি হুজুর (সঃ) এশার পর অনর্থক কথা কলতে নিষেধ করেছেন। হ্যাঁ... তবে এশার পর সাথে সাথে ঘুমিয়ে খুব ভোরে উঠার চেষ্টা করবেন। কারন ভোরের সামান্য সময়ের মুতালা ও রাত্রের কয়েক ঘন্টা মুতালা হতে উত্তম হয়ে থাকে। আর উত্তম কেনই বা হবেনা। হুজুর (সাঃ) তো দোয়া করেছেন-اَللَّهُـمَّ بَـارِكْ لِأُمَّتِيْ وَبُكُوْرِهَا.

‘হে আল্লাহ প্রভাতের সময় আমার উম্মতের জন্য বরকত নসিব করুন।’ ফজরের নামাজের পরপরই নাস্তা সেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন।

(১) দ্বিপ্রহরের সময় সংক্ষিপ্ত কায়লুলা করবেন। (অর্থাৎ দুপুরে খাওয়া দাওয়া পর সামান্য বিশ্রাম করবেন। এটা অত্যন্ত উপকারী ও খুবই জরুরী

(২) ঘুমানোর পূর্বে আগামী দিনের প্রোগাম ঠিক করে নিবেন। তাড়াহুড়োর অনুভুতি এবং কাজের বিশৃঙখলা দুর করার জন্য রাতে শোয়ার পূর্বে আগামী দিনের প্রোগ্রাম সাজাবেন। এভাবে কাজ বেশী হয় এবং ক্লান্তি কম হয়। যখন উস্তাদের এই অনূভূতি আসে যে, আমার মুতাআলা সঠিক ও যথেষ্ট হচ্ছে তখন স্নায়ুবিক ক্লান্তিহ্রাস পায়। কিন্তু তার মাঝে যখন এই অনুভুতি আসে যে, আমি অনেক কাজের ভীরে দরুণ যথার্থ ভাবে মুতায়ালা করতে পারিনা। ছাত্রদের প্রশ্নের সান্তনামুলক ও তৃপ্তিদায়ক উত্তর দিতে পারি না। তখন স্নায়ুবিক দুবর্লতা ও মস্তিষ্কের ক্লান্তি বৃদ্ধি পায়।

(৩) পকেট ডায়েরী সাথে রাখবেন। দিনভর দরসে যে সমস্ত প্রশ্ন আসবে, সেগুলো উক্ত ডায়রীতে

নোট করে রাখবেন । অতঃপর সন্ধায় বা রাতে মুতাআলার সময় দেখে নিবেন এগুলোর সমাধান কি এবং নিজের বড়দের কাজ জেনে নিবেন। এভাবে মুতাআলার সময় যেসব কাব্যমালা, বড়দের বানী, উদ্বৃতি সমূহ, তথ্য উপকারী ঘটনা, দৃষ্টান্তসমূহ মন মস্তিষ্ককে আকৃষ্ট করে, তা লিপিবদ্ধ করে নিবেন। যখন মন উদাস হবে, ক্লান্ত হবে, কোথাও গেলে একাকী বসে আছেন বা নিজের পালার অপেক্ষা করছেন অথবা যানবাহনের অপেক্ষায় আছেন, তখন ডায়েরী খুলে ঐ লেখাগুলো মুখস্ত করে নিতে পারেন। তদ্রুপ হাদিস গুলোও মুখস্ত করে নিন। অতঃপর ছাত্রদের শুনান। যদি উস্তাদ ছাত্রদের আরবী ভাষায় মৌখিকভাবেহাদিস বা আরবী কাব্যমালা শুনান, এমনিভাবে ইংরজী, ফারসী ইত্যাদি ভাষায়উদ্ধতি এবং তত্ত্ব বয়ান করেন, তাহলে তাদের মধ্যে আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারাও নিজেদের মধ্যে স্মরণ শক্তি ব্যবহার করবে। সারকথা ডায়েবীর মাধ্যেমে সবচেয়ে বড় যে উপকারটা হবে তা হলো- অনেক বিষয় যা আমাদের মস্তিকের উপর বোঝা হয়ে থাকত। এখন সেই বোঝাস্থানান্তরিত হয়ে ডায়েরর ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসবে।

(৪) ছাত্রদের গুণের উপর দৃষ্টি রাখবেন। ছাত্রদের ক্রটি নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে মানুষকে ভগ্ন স্বাস্থ মনে হয়। এবং এ দুশ্চিন্তা দ্বারা তাদের সংশোধনও হয় না বরং আরো অধিক নৈরাশ্য বৃদ্ধি পায়, উদাসভাব প্রবল হয়। সুতরাং ছাত্রদের গুনাবলীর সন্ধানে মগ্ন থাকুন। ছাত্রদের সংশোধনের জন্য ছিদ্রান্বেশনের পরিবর্তে প্রশংসা জ্ঞাপন অধিক ফলপ্রসু। যেসব গুণাগুণ দৃষ্টিতে পরবে, সেগুলোর আলাচনা করবে এবং যে ক্রটি গুলো দৃষ্টি গুচর হবে, সে গুলো গোপন করে নিবেন এবং সেগুলো সংশোধনের জন্য দু'আ করবেন যে-'হে আল্লাহ, অমুখ ছাত্রের পাঠে মন বসে না, তাকে আপনি হেদায়েত নসিব করুন। হে আল্লাহ, মাদ্রাসা/স্কুল হতে অমুখের মন উঠে গেছে, তার হৃদয়ে আপনি ইলম ও উস্তাদের মহব্বত দান করুন। হে আল্লাহ,অমুখ ছাত্র বেআদবির ব্যাধিতে আক্রান্ত, সহপাঠির সাথে বিবাদে অভ্যস্ত, হে আল্লাহ আপনি ঐ ছাত্রকে উক্ত ব্যধি হতে মুক্তি দান করুন। আমিন। এভাবে দুআ করত থাকলে ইনশা-আল্লাহ আপনি দেখতে পাবেন অল্প দিনের মধ্যেই এই শিশুর রুপ পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর তার ভবিষ্যতে আমলের পূন্য ও প্রতিদানের মধ্যে আপনার একটা অংশ থাকবে। পক্ষান্তরে বারবার ক্রটি সময়ের অলোচনা করলে স্বয়ং উস্তাদও ছাত্র উভয়েরই ক্ষতি হয়ে থাকে।

(৫) আমরা সকলেই জানি যে, মধু আল্লাহপাকের অগণিত নেয়ামতের মধ্যে এমন একটি নেয়ামত, যার কোনো বিকল্প নেই। এর মধ্যে আল্লাহ পাক অসংখ্য ব্যাধির নিরাময় রেখেছেন। শিক্ষকবৃন্দের উচিৎ মস্তিষ্কের ক্লান্তি দূর করার জন্য এবং নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য মধু অবশ্যই ব্যবহার করবেন। শীতকালে মধুর চা তৈরী করতে এক কাপ গরম পানির মধ্যে এক চামচ মধু দিবেন। শারিরিক দুর্বলতা, অসামর্থ্য, বুকে জ্বালা, হজম শক্তির দুর্বলতা, ঘাম কম অথবা দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া, রক্ত গাঢ়ো বা গ্যাস্ট্রিক, চেহারার উপর দাগ, অলসতা ও দুর্বলতা অনুভব, রক্ত নষ্ট ইত্যাদি ব্যাধিতে মধুর চা দ্বারা উপকার পাবে। এছাড়াও মাথা ব্যাথায় মধুর চা'য়ে উপকার হয়।

(৬) সপ্তম বিষয় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আসাতিযায়ে কেরাম যেভাবে দিনে দরস, তাদরিস, মুতআলা, মুরাজাআতে রিপ্ত থাকেন। তদ্রুপ রাতেও আসাতিজায়ে কেরামের চারটি কাজ করা উচিৎ। এ চারটি কাজ জাতির ইসলাহকারীদের জন্য এবং দ্বায়ীদের জন্য এমন জরুরি, যেমন জরুরী শরিরের জন্য খাদ্য।

ক) দিনে ১২/১৫ ঘন্টা মানুষের সাথে কথাবার্তার মাধ্যমে কেটেছে। এখন রাতে ১/২ ঘন্টা মুনাজাতের মাধ্যমে অতিবাহিত করুন। তাহাজ্জুদের ম্যাধমে আল্লাহকে কোরআনুল কারীম শুনান।

খ) নামাজের মধ্যে রাকাত দীর্ঘ করুন। রুকু-সিজদায় অধিক সংখ্যায় তাসবিহ পাঠ করুন।

গ) নিজের জন্য ও ছাত্রদের জন্য এবং সমস্ত উম্মতের জন্য দোয়া করুন- 'আল্লাহ, আপনি আপনার পরিপূর্ণ রহমত দ্বারা আমাদের পথ প্রদর্শন করুন। বিশ্বের মুসলিম জাতির উপর দয়া বর্ষণ করুন।'

ঘ) ইসতেগফার করবেন। আল্লাহপাক নেককার বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 'তারা ভোরবেলায় ইসতেগফার করে।' ইসতেগফার দ্বারা দুশ্চিন্তা দূর হয়। রিজিব বৃদ্ধি পায় এবং সন্তান-সন্ততি লাভ হয়।

অতএব এ চারটি কাজ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা উচিৎ।

ইলম শিক্ষা

হাফেজ মুহিবুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

ইলম শিক্ষার ওপর ইসলাম অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যেমেই মানুষ দ্বীনি ইলম হাসিল কলে। এ ইলম বা জ্ঞান হলো আত্মার আলো, মনের খোরাক। ইলমহীন মানুষ অন্ধের সমান। যারা ইলম নেই সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির রহস্য সম্বান্ধে কিছুই জানে না। তার কাছে গোটা সৃষ্টিজগৎ অন্ধকার। মহানবী সা.-এর প্রতি আল্লাহর প্রথম বানী হলো ইক্বরা পড়ে। আর পড়া মানেই ইলম হাদিস করা। ইসলাম বা জ্ঞান অর্জন ছাড়া নিজেকে জানা যায় না। আল্লাহকে চেনা যায় না। আল্লাহর অসীম কুদরত বোঝা যায় না। এজন্যই আল্লাহ পাক মানুষকে প্রথমে ইলম শিক্ষার কথাই বলেছেন, মানুষকে পড়তে বলেছেন। রাসূল সা. বছেছেন জ্ঞান অর্জন কার প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফর জবা অবশ্যই কর্তব্য। তিনি আরো বলেন ইলম অর্জনের জন্য যে বাড়ি থেকে বের হয়, সে আল্লাহর পথেই চলে। হাদীসে বর্ণিত আছে,ইলম লাবের জন্য যে নিজের জান কুরবান করে তার মৃত্যু নেই।

সময়ের গুরুত্ব

মাষ্টার ইউনুছ মিয়া
শিক্ষক, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদরাসা

সময় জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এর যথার্থ ব্যবহারের মধ্যে সাফল্য নিহিত। আল্লাহ মানুষকে অগণিত নিয়ামতের মধ্যে সময় সবচেয়ে দামি।

মানুষ সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। কাজকর্মে নিষ্ক্রিয় ও অলস হয়ে পড়ে। অলসতা একটি জাতির উন্নতির পথে হুমকি স্বরুপ।

অধিকাংশ মানুষ সুস্থ ও অবসরের সময়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। ফলে অসুস্থ বা ব্যস্ত হয়ে পড়লে তার কাছে সময়ের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি হয়। হাদিসের ভাষ্যমতে, খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ এই দুই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পরে।

এমন কি আল্লাহ তা’লা পবিত্র কুরআনে সময়ের কসম খেয়ে একটি সুরা নাযিল করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘দুটি নিয়ামত এমন রয়েছে যে, ব্যাপারে অধিকাংশ লোক প্রতারিত হয়। তা হলো-সুস্থতা ও অবসর সময়।’ (বুখারি, হাদিস: ৬৪১২)

তাই আমরা সময়কে কাজে লাগিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জন করি।

এসো সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরি

মাওলানা মাহমুদুল হাসান
শিক্ষক, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

আল্লাহর পক্ষ থেকে তার মদদ এর ভরসা নিয়ে আমি কলম ধরছি। ‘সুন্নাহ’ শব্দটি আরবী, তার শাব্দিক অর্থ হলো- পথ, পন্থা, নিয়ম, নীতি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ‘সুন্নাহ’বলা হয়, রাসূল সা. যে সকল কাজ করেছেন এবং তার সাহাবীগণও যে সকল কাজ করেছেন তাকেই সুন্নাত বলা হয়। তাহলে আমরা বুঝে নিলাম সুন্নাতের অর্থ কী? আসলে আমরা সবকিছু বুঝি ও জানি। কিন্তু তার উপর আমল করি না। আমল করতে আমাদের মনে-উৎসাহ জাগে না। কথায় আছে জানার নাম কামিয়াবী নয়, মানার নাম-ই কামিয়াবী। তাহলে বোঝুন আমরা শেষ নবী হযরত মোহুম্মদ সা.-এর উম্মত, তার উছিলায় পেয়েছি অন্ধকার থেকে আলোন পথ, সঠিক পথ, শান্তির পথ এবং আরো পেয়েছি সুন্নাত, যা আকড়ে ধরলে কখনো পথভ্রষ্ট হবো না। যেমন- হাদীস শরীফে আছে রাসূল সা, বলেছেন-আমি তোমাদের জন্য দু’টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যা তোমরা আঁকড়ে ধরলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তার একটি হলো আল-কুরআ-ান এবং অপরটি হলো সুন্নাত। এটা মানব জীবনে বাস্তবায়ন করা আমাদের কর্তব্য। তবেই আমরা শান্তির ছায়াতলে থাকতে পারব। তবে আমরা যদি ইসলামের ছায়াতলে শান্তিতে থাকতে চাই, তাহলে কুরআর-হাদীস অনুযায়ী জীবন রাঙ্গাতে হবে। প্রতিটি কাজে সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। তবেই হতে পারবো আমরা সফলতার পাত্র। রাসূল সা. আমাদের জন্য দ্বীনের উপর চলা সহজ করে দিয়েছেন। তার এক-একটি সুন্নাত সারা বিশ্ব থেকে অধিক মূল্যবান।

যেমন- হাদীস শরীফে আছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফিতনার যুগে আমার একটি সুন্নাতকে তার জীবনের বাস্তবায়িত করবে। সে ব্যক্তি একশ জন শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। তাই আমি সকল মুসলমানের আমলের আগ্রহ জানিয়ে প্রচলিত কয়েটি সুন্নাত তুলে ধরেছি। যথা- (১) খানার শুরতে উভয় হাত ধৌত করা। (২) ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করা। (৩) ঘুমানোর পূর্বে চোখে সুরমা ব্যবহার করা। (৪) ঘুমানোর পূর্বে তিনবার বিছানা ঝাড়ু দেওয়া। (৫) প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখা। (৬) চাশতের নামাজ আদয় করা। (৭) তিন শ্বাসে পানি পান করা। (৮) মিসওয়াক করা। (৯) কারো সাথে দেখা হলে সালাম করা। (১০) সর্বদা মুচকি হাসি দেওয়া ইত্যাদি।

প্রিয় পাঠ-পাঠিকা! আপনারা ভাবেত পারেন এ গুলোতো আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমি আবারও বলছি জানার নাম কামিয়াবী নয়, মানার নাম কামিয়াবী। সুতরাং সবজিনিসের-ই মডেল রয়েছে। আর আমদের অনুসরণের মডেল হলেন রাব্বে কারীমের প্রিয় হাবীব রাসূল সা.। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে রাসূল সা.-কে ভালোবাসতে হবে। রাসূল সা.-কে ভালোবাসার প্রমাণই হলো তার সুন্নতের উপর আমল করা। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর রেখে যাওয়া সুন্নত মেনে চলে আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ) এর ভালোবাসা হাসিল করার তাওফিক দান করেন আমিন।

ঈদুল আজহার তাৎপর্য ও সুন্নাত

মাওঃ হোসেন আহমদ ফারুক্বী [ইউ কে]

মুসলমানদের জীবনের আনন্দময় দু'টি ঈদের মধ্যে ঈদুল আজহা একটি। এ দিনে মুসলমানদের ইবাদত হিসেবে কুরবানী একটি ওয়াজিব আমল। ঈদুল আজহার দিনে ঈদগাহে জামা'আতের সাথে দু'রাকাত নামায আদায় করা পুরুষদের উপর ওয়াজিব।

বিশেষ ফজীলতের আমল : ১লা যিলহজ্ব হতে ৯ই যিলহজ্ব পর্যন্ত প্রত্যহ রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ সময়ের একদিনের রোযা অন্য সময়ের এক বছরের রোযার সমতুল্য এবং রাতে ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য। অন্য এক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত্রে জেগে থেকে ইবাদত করে, তার অন্তর ঐ সময়েও জিন্দা থাকবে-যখন অন্যান্য অন্তর মরে যাবে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক যুবকের অভ্যাস ছিল যিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখা দিতেই সে রোযা রাখতে আরম্ভ করত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা জানতে পেরে যুবকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন–এ দিনগুলোতে রোযা রাখার কারণ কি ? যুবকটি বলল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এ দিনগুলো পবিত্র হজ্বের প্রতীক ও হজ্ব আদায়ের মুবারক সময়। হজ্ব আদায়কারীগণের সাথে আমিও নেক আমলে শরীক হই রোযা রাখার মাধ্যমে এই আশায় যে, তাদের সাথে আমার দু'আ আল্লাহ পাক কবুল করে নিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন– "তোমার এক একটি রোযার বিনিময়ে একশ গোলাম আযাদ করার, একশত উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার এবং জিহাদের সাজ-সামানে ভরপুর একশ ঘোড়া জিহাদে পাঠানোর সমতুল্য সওয়াব রয়েছে। হাদীস শরীফে আছে– ৮ই যিলহজ্বের রোযার বিনিময়ে এক হাজার গোলাম আযাদ করার, এক হাজার উট দান করার এবং সাজ-সামানসহ জিহাদের জন্য এক হাজার ঘোড়া দান করার সমতুল্য ছাওয়াব লাভ হয়। আর ৯ই যিলহজ্বের রোযার বিনিময়ে দুই হাজার করে ছাওয়াব দান করা হয়। হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে– ৮ই যিলহজ্ব যে ব্যক্তি রোযা রাখল, আল্লাহ পাক তাকে হযরত আইউব (আঃ)-এর কঠিন পরীক্ষায় সবর করার সমতুল্য ছাওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আরাফাতের (৯ই যিলহজ্ব) দিনে রোযা রাখল, আল্লাহ পাক তাকে ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় ছাওয়াব দান করবেন। ঈদুল আজহার সুন্নাত সমূহ ঃ ঈদুল আজহা তথা কুরবানীর ঈদের দিনে বারটি কাজ সুন্নাত ঃ (১) মিসওয়াক করা। (২) গোসল করা। (৩) নিজের নিকট যে কাপড় আছে চাই নতুন বা পুরাতন হোক তার মধ্যে উত্তম কাপড় পরিধান করা। (৪) শরীয়ত সম্মত সাজ-গোজ করা। (৫) সুগন্ধি ব্যবহার করা। (৬) ঈদের দিনে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠা। (৭) সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া। (৮) সেদিন সকাল থেকে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোন কিছু আহার না করে ঈদের কুরবানী করে তার গোশত দ্বারা সেদিনের খানা শুরু করা। (৯) ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা। (১০) ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা। (১১) কোন উজর না থাকলে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। (১২) উচ্চ আওয়াজে তাকবীরে তাশরীক বলতে বলতে ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়া। শরীয়তের হুকুম পালনে সর্বপ্রকার কষ্ট-তাকলীফ বরদাশত করে এবং সব স্বার্থকে উপেক্ষা করে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। তাহলেই সার্থক হবে আমাদের উজহিয়া-কুরবানী, সফল ও কল্যাণমণ্ডিত হবে আমাদের জীবন। এছাড়াও এ তাকবীর ৯ যিলহজ্ব ফজর হতে ১৩ই যিলহজ্ব আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত নামাযে প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর একবার এ তাকবীর বলা পুরুষ-মহিলা সকলের উপর ওয়াজিব। এই তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে– "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ। পুরুষগণ এ তাকবীর স্বশব্দে বলবেন এবং মহিলাগণ নিঃশব্দে বলবেন। প্রতি বছর ঈদুল আজহা এসে নতুন ভাবে আমাদেরকে দ্বীনের জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার, মহান আল্লাহর হুকুমের নিকট সন্তুষ্ট চিত্তে আত্মনিবেদন ও গরীব-অসহায় মানব শ্রেণীর সহায়তা-সহযোগিতার দীক্ষা দিয়ে যায়। কুরবানীর পশু জবেহের সাথে সাথে নিজের নফস্‌কে জবেহ করে নফ্‌স থেকে তাকাব্বুর, রিয়া, অহংকার, অহমিকা, ক্রোধ প্রভৃতি কুরিপু দূর করতে হবে।

মুসলমানদের সন্তান আপনাদের নিকট আমানত

মুফতি সাইফুল ইসলাম (ইউ কে)

আদর্শ উস্তাদ থেকে সংগ্রহিত

শ্রদ্বেয় শিক্ষক শিক্ষিকা।

শিরোনামটি যদি নিজেকে বুঝাতে সক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবে আপনি একজন আদর্শ উস্তাদ হতে পেরেছেন এবং তাদরীসের হক আদায় করতে পেরেছেন।

এ কথাটি অন্তরে বসানোর জন্য একা একা নিজেকে সম্বোধন করে বুঝাবেন, উম্মত আমার কাছে অনেক কিছু আশা করে রেখেছে। এজন্যই আমার উপর ভরসা করে নিজের কলিজার টুকরা নয়নের মণিকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের রক্ষানাবেক্ষণ ও দেখাশোনার দ্বায়িত্ব আমার হাতে অর্পণ করেছেন। উম্মতের সবচেয়ে নিস্পাপ দলটি আমার হাতে অর্পিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ মেধার সম্ভাবনাময় বাচ্চাকে পিতামাতা আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তাদের মধ্যে এমন পিতামাতা আমার নিকট পাটিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তাদের মধ্যে এমন সন্তানও আছে যাদের খেদমত মাতাপিতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তারপরও ইলমের খাতিরে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য তারা আমার নিকট তাদেরকে পাঠিয়েছেন আমি তার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের বিশ্বাস ঠিক ঠিক রাখছি কিনা? বাচ্চাদের সময়ের হেফাযতের দায়িত আমাকে দিয়েছেন, আমি যে দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রাখছি কিনা? উম্মত তাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের লাগাম আমার হাতে দিয়ে তারা নিজ নিজ ব্যস্ত তায় লিপ্ত রয়েছে, আমি তাদের ভবিষ্যৎ গঠন করছি কিনা? উম্মতের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হাতে আছে কিনা। হুযুর আকরাম (সাঃ) এর নিম্নোক্ত মোবারক ইরশাদ আমার জন্য যতেষ্ট, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ দায়িত্বে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

অর্থাৎ যেসব বাচ্চা আমার নিকট ইলম অর্জনের জন্য এসেছে এরা আমার অধীনে এবং কিয়ামতের দিন এদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রত্যেক বাচ্চার ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করা কবে। ধনী মাতাপিতার সন্তদানদের ব্যাপারেও, গরীব মাতাপিতার সন্তানদের ব্যাপারেও। শিক্ষিত মাতাপিতার সন্তানদের ব্যাপারেও মূর্খ ও অশিক্ষিত মাতাপিতার সন্তানদের ব্যাপারেও মেধাবী বাচ্চাদেরও এবং ঐ বাচ্চাদেরও ব্যাপারেও যারা মাদরাসা ও স্কুলে বাসলে বাধ্য হয় বাড়ির তাড়া খেয়ে। প্রত্যেকটি বাচ্চার শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য আমি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছি? আমার নিজ যোগ্যতার কতটুকু ব্যয় করেছি? কতগুলো বাচ্চার ধারাবাহিক অনেক ক্রটি ও অপরাধ ধৈর্যের সাথে বরদাশ করেছি? অভিশাপ ও তিরস্কার এবং মারপিটের পরির্বতন রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে কতজনের নাম ধরে আল্লাহ পাকের দরবারে দুআ করেছি? কতজন বাচ্চার মেধাহীনতা দরুন অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে ঘন্টার বাইরে যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছি? কতজন ছাত্রছাত্রীর জন্য ফরয নামাযের পর নাম নিয়ে দুআ করেছি? কতজন বাচ্চাকে নামাযের ফযীলত এমনভাবে মুখস্ত করিয়েছি, যাতে তার জামাতের সাথে নামায ছুটে না যায়? কতজন ছাত্রকে মাতাপিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধার বিষয়ে এতগুলো রচনা লিখিয়েছি এবং এমন মানসিকতা তৈরী করেছি যে, এখন আর বেয়াদবী করে না? প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকার জন্য চিন্তার বিষয় এই যে, কেয়ামতের দিন যখন ছাত্রদের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করা হবে তখন কী উত্তর থাকবে আপনার নিকট আপনি কি বাস্তবে সেগুলো পালন করছেন, যেগুলো আপনার উপর ফরয দায়িত্ব ছিল?

মুসলিম জনসাধারণ নিজের ব্যক্তিগত পয়সা বাঁচিয়ে এই মাদরাসা এবং স্কুলের চাঁদা দেন এজন্য যে, আমাদের এই সম্ভাবনাময় শিশুগুলো এক সময় জাতি গঠনকারী হয়ে সামনে উপস্থিত হবে। তার দ্বারা পুরো উম্মতের উপকার হবে। এ বাচ্চা আল্লাহর দীনের রক্ষক হবে এবং উৎকৃষ্ট জনসংখ্যা দ্বারা সমাজ সমৃদ্ধ হবে।

মোটকথা, আপনার সামনে যে একজন তালেবে ইলম উপবিষ্ট, তার এ পযর্ন্ত পৌঁছাটা অনেক লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুআ ফলাফল এবং অনেক লোকের অনেক প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এজন্য শিক্ষক শিক্ষকাদের উচিত এ ধাপগুলো নিয়ে চিন্তা করা এবং এগুলোর নাজুকতা অনুভব করা।

এরপর ফায়সালা করবেন যে, যদি আমার দ্বারা পাঠদানের হক আদায় হয়, তাহলে এ পাঠদানই আল্লাহর ভাণ্ডার হতে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে পুরস্কার লাভের মাধ্যম হবে। এর কারণে শুধু আমার উপরই নয় বরং আমার পরিবার পরিজনের উপরও রহম করা হবে। আল্লাহ পাকের নূরানী মাখলুক ফেরেশতারা আমার জন্য দুআ করবে। পানির মাছও আমার জন্য দুআ ও ইস্তেগফার করবে, পিঁপড়ারা আমার জন্য দুআ করবে। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ আল্লাহর দৃষ্টিতে যেন প্রকৃতই কাজের কাজী হন এবং তাদের কাজ যেন আল্লাহর দরবারে কবুলও হয়ে যায় আমিন।

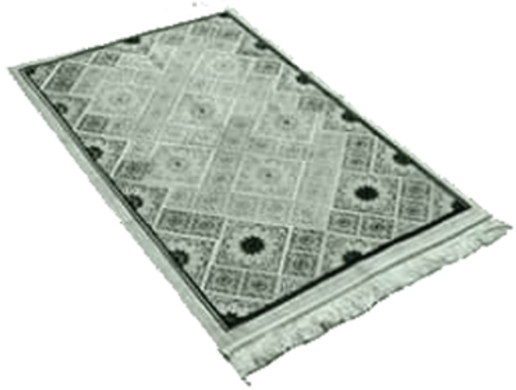

ফজরের সালাতের ১০টি ফজিলত

হাফিজ মাওলানা ইনাম বিন সিদ্দিক

এগুলো জানার পর কারো আরফজর সালাতে গাফেলতি, অলসতা আসবেনা.. ইনশাআল্লাহ্
১। ফজরের সালাত মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যকারী, কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুনাফিকের জন্য ফজর সালাত আদায় কষ্টকর (বুখারী ৬৫৭,৬৪৪,২৪২০,৭২২৪.... মুসলিম ৬৬১)
২। রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি ঐ দিন আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তালা ঐ ব্যক্তির দ্বায়িত্ব নেন। (সহিহ মুসলিম তিরমিজি ২১৮৪)
৩। রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করবে আল্লাহর ফেরেশতাগন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিকে ভালো মানুষ হিসেবে সাক্ষী দিবে। (বুখারী-মুসলিম)
৪। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ফজর সালাত জামাতের সাথে আদায় করে আল্লাহতালা তার আমলে দাড়িয়ে সারারাত নফল নামাজ আদায়ের সওয়াব দিয়ে দেন (সহিহ মুসলিম --১০৯৬)
৫। রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি ভোরে হেঁটে হেঁটে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে প্রবেশ করবে আল্লাহতালা কিয়ামতের দিন তার জন্য পরিপূর্ণ আলো দান করবেন। (আবু দাউদ--- ৪৯৪ তিরমীযি)
৬। যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত দান করবেন। অথাৎ সে আল্লাহর দিদার লাভ করবে এবং জান্নাতি ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্নিমার রাতের আকশে চাঁদের মত দেখবে। (বুখারী-৫৭৩)
৭। যে নিয়মিত ফজরের সালাত আদায় করবে সে কখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা। (সহিহ মুসলিম ৬৩৪)
৮। ফজরের সালাত আদায়কারী রাসূল (সাঃ) এর বরকতের দোয়া লাভ করবেন। (সুনানে আবু দাউদ মুসনাদে আহমাদ)
৯। ফজরের দু রাকাত সুন্নত সালাত দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তারচেয়ে উত্তম (জামে তিরমিজ ৪১৬)
১০। ফজরের সালাত আদায়ের ফলে ব্যক্তির মন ফুরফুরে প্রফুল্ল হয়ে যায়। (সহিহ বুখারী সহিহ মুসলিম)
সুবহানআল্লাহ আল্লাহুর আমদের উপরোক্ত সব নিয়ামতের ভাগীদার করুন আমীন।

জরুরী মাসআলা

ক্বারী মাওলানা মুহিবুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা

ইসতেঞ্জা আদবঃ
অর্থাৎ পায়খানা পেশাব করার সময় নিচের কাজগুলি করার নিষেধ।
কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করিয়া বসা। রাস্তার উপর বা রাস্তার কিনারায় পেশাব পায়খানা বা কোন গর্তের ভিতরে পেশাব পায়খানা কারা।
চন্দ্র ও সূর্যের বরাবরে বসা।
পায়খানায় বসিয়া কথাবার্তা বলা।
লজ্জাস্থানের দিকে দেখিয়া থাকা হাড্ডি, কয়লা দিয়ে ঢিলা লওয়া।
দাড়াইয়া বা হাটিয়া হাটিয়া পেশাব করা।
পানিতে পেশাব করা।
ফলদার বা ছায়াদার গাছের নিছে পেশাব পায়খানা করা।

অজুতে ৪ ফরজ
১। সমস্ত মুখ ধোয়া, (মাথার চুলের গোড়া থেকে তুতনীর নিচ পযর্ন্ত এক কানের লতি হইকে অন্য কানের লতি পযর্ন্ত মুখমন্ডল ধোয়া)
২। দোন হাতের কুনুইসহ ধোয়া
৩। মাথা মাসেহ করা, (মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা)
৪। দুই পায়ের টাকনু (ঘন্টা বা পেন্ডলী) সহ ধোয়া। চুল পরিমান-স্থান জায়গা যদি শুকনা থাকে অজু হবেনা।

গোসলের ৩ ফরজ
১। কুলি করা, গড়গড়ার সঙ্গে আদায় করা অবশ্য (রমজান মাস ব্যতিত)
২। নাকে পানি দেওয়া নাকের নরম (স্থান)জায়গা পযর্ন্ত পানি পৌছানো।
৩। সমস্ত শরীর ভলো ভাবে ধৌত করা। (অবশ্য শরীরে নাপাকী থাকলে আগে পরিষ্কার করা)।

অজু ভঙ্গের কারণ সমুহ
১। পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বাহির হওয়া।
২। মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।
৩। শরীরের কোন স্থান হইতে রক্ত বা পুঁজ-পানি বাহির হয়ে গড়াইয়া পড়া।
৪। থুথুর সঙ্গে রক্তের পরিমান বেশি হওয়া।
৫। চিত বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া।
৬। পাগল, মাতাল, জ্ঞানহারা অচেতন হলে।
৭। নামাযে উচ্চস্বরে আওয়াজে হাসিলে।

নামাজের ফরজ সমুহঃ
মাসআলাহঃ ইচ্ছাকৃত বা ভুল বশত ফরজ তরক বা ছুটিয়া গেলে নামাজ হবে না।
নামাজের বাহিরের ফরজ সমুহঃ
শরীর পাক, কাপড় পাক, নামাজের জায়গা পাক, ছতর ঢাকিয়া রাখা, কেবলা মুখী হওয়া, ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়া, নামাজের নিয়ত করা।

নামাজের ভিতরের ফরজ সমুহঃ
তাকবিরের তাহরিমা (অর্থাৎ আল্লাহ আকবার) বলা। খাড়া (দাড়াইয়া) নামাজ পড়া, কেরাত পড়া, রুকু করা, দুই সেজদা করা, আখেরী বৈঠক

নামাজের ওয়াজিব সমূহঃ
মাস আলাহ নামাজে ভুলবশত কোন ওয়াজিত

ছুটিয়া গেলে নামাজ শেষে সেজদায়ে সাহ করিলে নামাজ হইয়া যায়। তবে ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব তরক করলে নামাজ হবেনা বা পুনরায় আদায় করিতে হইবে।

১। আলহামদু (সুরা ফাতিহা) পড়া

২। আলহামদু সঙ্গে সুরা মিলানো

৩। রুকু সেজদায় দেরী করা

৪। রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হইয়া দেরী করা

৫। দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসিয়া দেরী করা।

৬। দরমিনয়ানী (প্রথম) বৈঠক

৭। দোন বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়া

৮। ইমামের জন্য কেরাত আস্তে এবং জোড়ে পড়া

৯। বিতরের রামাজে দু আয়ে কুনুত পড়া

১০। প্রত্যেক ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতেকে কেরাতে জন্য নির্ধারিত করা।

১১। প্রত্যেক রাকাতের ফরজগুলির (তারতীব) ধারাবাহিকতা ঠিক করা।

১২। প্রত্যেক রাকাতে ওয়াজিব গুলির (তারতীব) ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা

১৩। আসলামু আলাইকুম বলিয়া নামাজ শেষ করা।

১৪। দুনো ঈদের নামাজে ছয় ছয় তাকবীর বলা।

নামাজ ভঙ্গের কারণ সমুহঃ

নামাজের ভিতরে কথা বলা।

কোন লোক কে সালাম দেওয়া।

সালামের উত্তর দেওয়া।

উহ আহ শব্দ করা।

বিনা অজরে কাশা (কাশি) দেওয়া।

আমলে কাছির করা।

বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া কাঁদা।

তিন তাসবিহ পরিমান ছতর খুলিয়া থাকা।

মুক্তাদী ব্যতিত অপন ব্যতির লোকমা নেওয়া।

সু সংবাদ ও দুঃ সংবাদে উত্তর দেওয়া।

কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরিয়ে যাওয়া।

নামাজে শব্দ কারয়া হাসা।

নামাজে সাংসারিক (দুনিয়াবী) কোন বিষয় প্রার্থণা করা।

হাচির জবাব উত্তর দেওয়া।

ইমামের আগে মুক্তাদী দাড়ানো।

জরুরী মাসনূন দোয়া সমুহঃ

নিদ্রা (ঘুমে) যাইবার সময় দোয়া:-

اَللّٰهُمَّ بِاِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَ

নিদ্রা (ঘুম) হইতে জাগ্রত হইতে দোয়া

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

ইস্তিঞ্জা (বাথরুমে) যাওয়ার সময় দোয়াঃ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

ইস্তিঞ্জা (বাথরুম) হইতে বাহির হইবার সময় দোয়া

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الاَذَي وَعَافَانِيْ

মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

মসজিদ হইতে বাহির হইবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

খানার শুরুতে দোয়া

بِسْمِ اللهِ وَعَلَي بَرَكَةِ اللهِ

খানার শুরুতে দোয়া ভুলিয়ে গেলে

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

খানা শেষে এই দোয়া

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

অজু করার পদ্বতিঃ

১। অজুতে নিয়ত করা সুন্নত। ২। বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত। ৩। দোন হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ৪। তিনবার মেছওয়াক করা সুন্নত। ৫। তিনবার কুলি করা সুন্নত। ৬। তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নত। ৭। সমস্ত সুখ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ৮। ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ৯। বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ১০। দোন হাতের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নত। ১১। সমস্ত মাথা একবার মাছেহ্ করা সুন্নত। ১২। কান মাছেহ্ করা সুন্নত। ১৩। গরদার মাছেহ্ করা মুস্তাহাব। ১৪। ডান পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ১৫। বাম পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ১৬। দোন পায়ের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নত।

কবিতা

আল আকসার কান্না
হা. আব্দুর রহিম

এসো হে সালাহউদ্দীন ফিরে আরেকটি বার,
মুসলিম বিশ্ব তোমার জন্য করছে এন্তেজার।
আজ আমাদের প্রয়োজন তোমারই মতো বীর,
বুক পেতে যে ধারণ করবে শক্রুর ছোড়া তীর
ফিলিস্তিনে জ্বলছে আগুন পুড়ে সব সাড়া,
আমাদেরই আল আকসা হয়েছে হাতছাড়া।
খনন করে মাসজিদটাকে ধ্বংস করতে চায়,
সে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে আজ ইয়াহুদী সম্প্রদায় ।
তৃতীয় ধারায় ক্রুসেড যুদ্ধ হয়েছে আবার শুরু,
নেতানাহু নামক ইয়াহুদীরাজ সেজেছে নাটের গুরু।
তিলে তিলে খেতে লেগেছে পুরো আরব ভুমি,
তবুও কি হে বীর সালাহউদ্দিন থাকবে ঘুমে তুমি ।
মুসলিম বিশ্ব আজ অমানিশায় গেছে ছেয়ে,
তুমি বিনে আর কে জাগাবে বিজয়ের গান গেয়ে।
তোমায় আমি আমি আল্লাহর নামে করছি আহ্বান,
রক্তাক্ত তীর ক্রুসেড করে দিয়ে যাও অবসান।

বাবা আমার বাবা
উমর আহমদ ফারুক্বী

মা, বাবার আদর ছেড়ে
এলাম লেখা-পড়ার তরে।
বাবার কথা মনে হলে,
অশ্রু কেবল ঝরে।
কেমন আছো বাবা আপনি,
দেখতে চাহে আখিঁ।
আপনার সোহাগ ভুলে,
বাবা কেমনে থাকি আমি।
আছো শিয়রে বসে।
জেগে দেখি বাবা আপনি
নেইগো আমার পাশে।
বাবা আপনি আমার তরে
কষ্ট সয়েছ শত,
তাইতো বাবা স্মৃতি আপনার
ভাসছে অবিরত।

ফিলিস্তিনে আমরা শিশু
হাফেজ মুজিবুর রহমান

বোমার আঘাতে বসতভিটা সব পুড়ে হলো ছাই ।
শহীদ হয়েছেন আব্বু আম্মু আদরের ছোট ভাই।
ফিলিস্তিনে আমরা শিশু আজ বড় অসহায় ।
হে দয়াময় রহম কর তোমার রহম চাই।
আকাশ থেকে বজ্রের মতো বোম পড়ে শত শত
আমার মতই ছটপট করে কচিকাচা প্রাণ কত ।
কত শিশুর প্রাণ কেড়ে নেয় ইসরাঈলের গুলি ।
ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখা যায় কেমনে এ শোক ভুলি ।
মাজলুম মোরা তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহ নাই ।
হে দয়াময় রহম কর তোমার রহম চাই।
বিশ্বের সব শিশুরা কাটায় হেসে খেলে রাত দিন ।
আমরা কাটাই মৃত্যুভয়ে আহার নিদ্রাহীন ।
ফিলিস্তিনের আকাশ বাতাশ, কালচে ধোঁয়ায় ঢাকা ।
পাব কি আর সেই সোনালী দিন আদর সোহাগ মাখা ।
নিশ্চয়ই পাব হতাশ হতে বারণ করেছ তুমি।
লড়ব একাই বিশ্বসবাসী থাকনা সবাই ঘুমি।
বাইতুল আকসা বাচাতে না হয় দেব এজীবনটাই।
হে দয়াময় রহম কর, তোমার রহম চাই ।

তোরাই আসল জঙ্গি
মাওঃ মুতাসিম বিল্লাহ সেলিম নবিগঞ্জী

যখন তখন ফিলিস্তিনে
হামলা করে ওরা,
মানবতার ধ্বজাধারী
ঘুমিয়ে থাকিস তোরা।
কস না কিছু আঙ্গুল তুলে
হস জালিমের সঙ্গী,
মানবতার খুনি তোরা
তোরাই আসল জঙ্গি।

কুড়ানো মানিক

মাওলানা নূরুলহক (ইউ কে)

হযরত আলী (রাঃ)- এর অমূল্য বাণী

দুষ্টলোকদের কোন সৎকর্ম দেখে ধোকায় পতিত হইও না। কেননা, এর পিছনেও কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অনুরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করো না। কেননা, ভুল-ত্রুটি মানুষ মাত্রই হতে পারে।

সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বিপদের সম্মুখীন হয়, যার সামর্থ্য কম হওয়া সত্বেও সাহস এবং চক্ষলজ্জা বেশি।

অন্যের বদ অভ্যাগুলোকে খারাপ জানার পরও যে ব্যক্তি সেসব থেকে দূরে থাকে না, সেই সর্বাপেক্ষা বড় আহমক।

মৃদুভাষী ব্যক্তিরাই সচরাচর সঠিক বথাবার্তা বলে থাকে।

সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণই সারগর্ভ কথাবার্তা বলতে পারেন।

যে ব্যক্তি কথাবার্তায় বক্র ধরনের তার স্বভাব বক্র হওয়াটাও স্বাভাবিক।

সবার সাথেই তার বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করো।

সামর্থ্য কম থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি অন্যকে দিতে কুণ্ঠিত হয় না সে সাধারণত অনেব বেশি উদার সহযোগিতা পাওয়ার দাবি রাখে।

অনুগ্রহ প্রাপ্তি সর্বাপেক্ষা বেশি দাবিদার ব্যক্তিগণ হচ্ছেন, যে আলেমের ওপর জাহেলরা হুকুম চালায়, যে শরীফ ব্যক্তির ওপর ইতর প্রকৃতির লোক হুকুমদারি করে, সে নেক্কার ব্যক্তি যার ওপর দুষ্কর্মশীল পাপী ব্যক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করতে যেও না যার সাথে পেরে ওঠার সম্ভাবনা নাই।

প্রতিটি মানুষেরই মূল্যনির্ধারিত হয় তার জ্ঞানের বহর অনুপাতে।

আত্মম্ভরিতা এবং অহঙ্কার মানুষের দ্বীনদারী ধ্বংস করে দেয়।

মিথ্যাবাদী চক্ষুলজ্জা, হিংসুকের মানসিক শান্তি এবং দুর্ব্যাবহারকারীর ভাগ্যে নেতৃত্ব জোটে না। মন্দ স্বভাবের সঙ্গী-সাথীই মানুষের সবচাইতে বড় শত্রু।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)

পৃথিবীর কোনো একজন মানুষের প্রতিও যদি তোমার কোনো প্রত্যাশা বা ভীতি অবশিষ্ট থাকে তবে তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। (ঐ)

প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন কিছুতেই পরিপূর্ণ স্বস্তি লাভ করতে পারে না। কেননা, হালাল যা কিছু আসে তার সাথে হিসাব দেওয়ার দায় বর্তে এবং হারামের সাথে আসে আজাবের ভীতি। (ঐ)

সৃষ্টিকর্তার দিক থেকে অন্ধ হওয়ার পরই কেবল মানুষ অন্য মানুষের সামনে হাত পাততে উদ্বুদ্ধ হয়। (ঐ)

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে মৌনতার দীক্ষা গ্রহণ করা। (ঐ)

নিষ্কর্মা ব্যক্তি মাটির বুকে একটা বোঝাবিশেষ। (ঐ)

যার ক্রোধ বেশি, এরূপ ব্যাক্তির ভাগ্যে অণ্যের বন্ধুত্ব কমই জুটে থাকে।

যে ব্যাক্তি নির্জনতাকে ভয় পায়, প্রকৃত শান্তি তার ভাগ্যে জোটে না। (ঐ)

যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়ানা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয় সে রহমতের কাফন দ্বারা আবৃত হয়ে চিরশান্তির জমিনে দাফন হওয়ার যোগ্য।

যেসব বান্দাহ আল্লাহর নিকট মকবুল হয় তাদের উপরই দুনিয়ার জীবনে কোন কোন জালিম আপতিত হয়। (ঐ)

কেউ যদি কোন ধনবান ব্যক্তিকে শুধূমাত্র তার ধনাঢ্যতার কারণে অতিরিক্ত সম্মান দেখায়, সে তার নিজের দ্বীনদারীর দুই তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে ফেলল

হযরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রাহঃ)

সমগ্র সৃষ্টিজীবের প্রতি যার ভালোবাসা নাই, সে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নয়।

ভূমিকাঃ
ইসলাম হচ্ছে মানবজাতীর একটি পরিপূর্ণ সংবিধান। আর ইসলাম ধর্ম ব্যাতীত পৃথিবীর মাঝে যত ধর্ম আছে সব ভ্রান্ত ও মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ পাকের নিকট এগুলোর সামান্য পরিমানও মূল্য নেই। তাই মহান আল্লাহ পাক সূরা আলে ইমরানে বলেন- নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম। আল্লাহর হাবিব রাসুলে আরাবী (সা:) বলেছেন, ততক্ষন পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবেনা- যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বান্দাও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। (আল হাদিস)। তাই যে শিক্ষায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করনে ওয়ালা তৈরি করে সে শিক্ষাই আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন। মানব রচিত শিক্ষা কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনা।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ
অত্র এলাকার মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চাদের দ্বিনী শিক্ষা প্রদান ও একই সাথে বয়স্কদের মধ্যে দ্বিনী চিন্তা চেতনার প্রচার প্রসারে ঘটানোর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম ভিত্তিক মসজিদকে আমলের দ্বারা আবদ্ধ করাই হলো উক্ত জামেয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নামকরণঃ
ইংল্যান্ড প্রবাসী এবং বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হাদিয়ে মিল্লাত কুতুবে জামান আল্লামা হাফেজ শায়খ ইউসুফ মুতালা (রহ.) এর নির্দেশে এবং আরো অনেক উলামায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর নামানোসারে উক্ত মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়- জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা।

অবস্থানঃ
হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলাধীন কাজীগঞ্জ বাজার রোডে তাজপুর (মাদবপুরে), নিরিবিলি ও কুলাহলমুক্ত পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান।

প্রতিষ্ঠাকালঃ
সিলেটের সুনামধন্য বুজুর্গ পীরে কামেল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আমিন উদ্দিন শায়খে কাতিয়া (রহ.) আল্লামা উব্দুল মুমিন শায়েখে ইমামবাড়ী ও আল্লামা তাফাজ্জুল হক মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জী, হজরত মাওঃ জমির উদ্দিন সাহেব, শায়েখে জালালপুরী ও হজরত মাওঃ আব্দুল মান্নান, শায়েখে গুনই (রহ.) উনাদের উপস্থিতিতে ভিত্তি প্রস্থর প্রতিষ্টা হয়। ১৯ শে জানুয়ারী ২০০৪ সনে উক্ত জামেয়ার সূচনা হয়।

প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপালঃ
হবিগঞ্জ জেলার সুনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, নবীগঞ্জ নয় মৌজার গৌরবময় কৃতিত্বপূর্ণ ব্যক্তি লন্ডন প্রবাসী, হযরত শাহ জালাল লিডস মসজিদের সাবেক ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা শায়খ আবু তাহের ফারুকী (দা.বা.)। নিজস্ব সাড়ে ৪ কেদার জমিনের উপর এই জামেয়াটি প্রতিষ্ঠা করেন। এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সকল প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব নিজ হাতে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের পরামর্শক্রমে।

মুহতামিমে জামিয়ার জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম:শায়খ মাও. আবু তাহের ফারুকী ১৯৬৫ সনের ৭ ই মে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহী ঘোলডুবা গ্রামে এক দ্বীনদ্বার সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা:মরহুম হাজী আঃ মন্নাফ। মাতা:আলহাজ্ব রহিমা বিবি। দাদা:মরহুম আলহাজ্ব মুন্সি হোসমত উল্লাহ।

উনার ওপর দাদা: মরহুম আলহাজ্ব মুন্সি আসাদ উল্লাহ সাহেব,তারা নিষ্টার সাথে অনেক দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এলাকার মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে তাদের কাছ থেকে অনেক অলৈকিক ঘঠনাও প্রকাশ পেয়েছে। দুজনই এলাকার মধ্যে সুনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৩ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। দুই ভাই হচ্ছেন আলহাজ্ব মরহুম শাহাদাত আলী ও আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান।

শিক্ষাজীবন:তিনি গ্রামের সাবাহী মকতবে মরহুম ক্বারী আবু মূসা রহ. এর নিকট প্রাথমিক আরবী শিক্ষা লাভ করেন। এবং গ্রামের প্রাথমিক স্কুল থেকে বাংলা শিক্ষা অর্জনের পর ঐতিহ্যবাহী তাহিরপুর আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ণ করেন। অত:পর তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। অত:পর আল্লামা নুর উদ্দিন গহরপুরী (রহ.), আল্লামা আব্দুল মুমিন শায়খে ইমামবাড়ী(রহ.), এবং জামেয়া ইসলামিয়া উমেদনগর মাদ্রাসায় আল্লামা তাফাজ্জুল হক মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জী (রহ.) এর কাছ থেকে (১৯৮৯-৯০) সনে সিহাহ সিত্তাহ হাদিসের সনদ গ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পর তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। সেখানে জামেয়া উম্মুল কুরা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে হাদিস শাস্ত্রেবুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি পবিত্র হারাম শরীফের ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ বিন ছুবাইল রহ. এর নিকট কিতাবুত তাওহীদ ও অন্যান্য কিতাবাদী অধ্যয়নের পর পবিত্র হারাম শরীফের ভিতরে শায়খ মুহাম্মদ মক্কীর নিকট পবিত্র কুরআন এর তাফসীর কোর্স সমাপ্ত করেন এবং ব্রিটেনের একটি উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা থেকে ইফতা কোর্স করেন।

এছাড়াও তিনি মাও. আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.), হাফিজ ফরিদ উদ্দিন (রহ), হা. মাও. আব্দুল ওয়াহীদ (রহ.) প্রমুখসহ অসংখ্য বিজ্ঞ বিজ্ঞ উস্তাদগণের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন।

কর্মজীবন:কর্ম জীবনে তিনি সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে বিভিন্ন মসজিদে ইমাম ও অন্যান্য চাকুরীজিবী হিসাবে প্রায় ১২ বছর দায়িত্বপালন করেন। অত:পর ১৯৯০ সালে সৌদি আরব থেকে বৃটেনে চলে যান। সেখানে ওল্ডহাম মদীনা মসজিদে ১ বছর, বার্মিংহামশাহজালাল মসজিদে ৪ বছর এবংলিড্স শাহ জালাল মসজিদে প্রায় ১৫ বছর ইমামতীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি মসজিদে কুবা (ইউ কে) তে ইসলামি শিক্ষক ও ইমাম হিসেবে কর্মরত আছেন।

বৈবাহিক জীবনিঃ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খনকারী পাড়া নিবাসী, আলহাজ্ব শায়েস্তা মিয়া চৌধূরীর ৫মা কন্যা জয়নব বিবি চৌধুরীর সাথে ১৯৮৬ সালের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ৩ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তানের জনক। তারা হলেন- হাফিজ মাওলানা মুশতাক আহমদ ফারুক্বী, নাসরীন তাইয়্যিবা ফারুক্বী, মাওলানা হোসাইন আহমদ ফারুক্বী, হাফেজ জুবায়ের আহমেদ ফারুক্বী ও আমিনা তাহের ফারুক্বী। উনাদের ঔরসে তিনার আরো ৭ জন নাতি-নাতনী রয়েছেন। তারা প্রত্যেকে দ্বীনি শিক্ষায় নিয়োজিত। মহান আল্লাহপাক নিবেদিতপ্রাণ ও আলেমেদ্বীন ও খাদেমে মিল্লাতের পূণ্যময় হায়াত ও কর্মময় জিন্দেগীতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অশেষ বরকত দান করুন।

প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে একজন:তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-

১। জামেয়া খাতামুন্নাবিয়্যীন ব্রার্কফোর্ট (ইউ কে)

২। জয়তুন ইনস্টিটিউট(ইউ কে)

৩। জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

৪। ফারুক্বী ট্রাস্ট (এই ট্রাস্ট এর মাধ্যমে গরিব অসহায়ের ঘর-বাড়ী নির্মান, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, বিবাহশাদি ও নগদ আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি জনসেবা মূলক কাজ করে থাকেন।

৫। এছাড়াও অনেক সাবাহি, মক্তব ও অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন।
জামেয়া ফারুক্বীয়া তাজপুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব সাড়ে ৪ বিঘা জমি এবং সামনের দিকে আরো ৬ বিঘা জমি এবং ঘোলডুবা ২ টি পরিবারে ২ বিঘা জমিতে মসজিদসহ মোট ১২ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়লা যেন এসমস্ত দ্বীনি কাজ গুলোকে এখলাছের সাথে আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দান করেন। আমিন।
সংগঠক:সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন সংগঠনের সংগঠক হিসাবে তার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জমিয়তে ইসলাম ইউরোপ এর সহ সভাপতি, তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওতের সহ সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নবীগঞ্জ শাখার প্রধান উপদেষ্ঠা ও হবিগঞ্জ জেলা জমিয়তের সহ সভাপতি।
এছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন।

জামেয়ার বৈশিষ্ট্য:

>> মেধাবী ছাত্রদেরকে মাত্র ২ বছরে হিফজ সমাপ্ত ।
>> নূরানী পদ্ধতিতে মাত্র ৩ বছরে প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্তি।
>> আবাসিক ছাত্রদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত খাবার খাওয়ার সুব্যবস্থা।
>> পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেওয়ার ব্যবস্থা ।
>> ইবতেদায়ী পঞ্চম ও হিফজ তাকমিলের ফাইনাল বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধা । ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ।
>> আবাসিক-অনাবাসিক (আবাসিক ছাত্রদের জন্য ২৪ ঘন্টার নেগরানি) । মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি পুরস্কার প্রদান ।
>> মেধা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক ইজলাস এর ব্যবস্থা।
>> জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ।
>> দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পাঠদান ।
>> সার্বক্ষনিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা তত্বাবধান।

এক নজরে জামেয়া

প্রতিষ্ঠানের নাম : **জামেয়া ফারুকীয়া তাজপুর মাদরাসা**
স্থাপিত: ২০০৪ ইংরেজি
অবস্থান: তাজপুর, কাজীগঞ্জ বাজার, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম: শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুকী
নায়েবে মুহতামিম: হাফিজ মাওঃ মুশতাক আহমদ ফারুকী
শিক্ষা বিভাগ: হিফজ বিভাগ, নাযেরা বিভাগ, কিতাব বিভাগ (মক্তব পাঞ্চম পর্যন্ত) নুরানী বিভাগ [নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত]
শিক্ষাবোর্ড: বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। আযাদ দ্বীনি এদ্বারা বোর্ড সিলেট। হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। নুরানী তালিমুল কোরআন বোর্ড, বাংলাদেশ
শিক্ষাবর্ষ: শাওয়াল-শাবান
শিক্ষক: ১০ জন। কর্মচারী: ৩ জন ছাত্র: ২০০ জন।
ভর্তি: ৮ শাওয়াল হতে শুরু।

যোগাযোগ: ০১৭২৬০২২৭৭৮, ০১৭৫৬৪৭৮৭৫২

যে সমস্ত মনিষিদের পদচারনায় জামেয়া ধন্যঃ

খলিফায়ে মাদানী আল্লামা আঃ মুমিন শায়খে ইমামবাড়ী (রহ.)
আল্লামা আমীন উদ্দিন শায়খে কাতিয়া (রহ.)
আল্লামা তাফাজ্জুল হক মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জী (রহ.)
হযরত মাও. জমির উদ্দিন সাহেব শায়খে জালালপুরী (রহ)।
হযরত মাও. আব্দুল মান্নান শায়খে গুনই (রহ.)।
শেখ আব্দুর রহমান শায়খে ধুলিয়া রহ.।
শায়খ আব্দুল মন্নান দত্তগ্রামী রহ.
শায়খ আব্দুল হক গাজিনগরী রহ.
মাও. মুখলিছুর রহমান কিয়ামপুরী।
মাও. সৈয়দ ফজলুল করীম, পীর সাহেব চরমোনাই।
মাও. উবাইদুল হক খান সাহেব (রহ.)।
মাও. মুহি উদ্দিন খান সাহেব (রহ.)।
মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া (রহ.)।
মাও. মুহিব্বুল হক গাছবাড়ী (রহ)।
মাও. মুফতি তালেবুদ্দিন সাহেব (রহ)।
মাও. নুরুদ্দিন সাহেব (রহ.)।
মাও. ক্বারী বেলায়েত সাহেব (রহ.)।
মুফতি আব্দুল হান্নান সাহেব, সভাপতি, ইউরোপ জমিয়ত।
মাও. রশিদুর রহমান ফারুক বর্ণভী ।
মাও. মুহসিনুল হক শায়খে কৌড়িয়া।
মুফতি সাইফুল ইসলাম সাহেব, ইউকে।
মুফতি জুনাইদ আহমদ সাহেব।
মাও. ফজলুর রহমান বানিয়াচঙ্গী।
মাও. ইমাম উদ্দিন সাহেব।
জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, সাবেক এমপি।
জনাব শেখ সুজাত মিয়া, সাবেক এমপি।
জনাব শাহ নেওয়াজ মিলাদ গাজী, সাবেক এমপি।
জনাব মুনিম চৌধুরী বাবু, সাবেক এমপি।
জনাব তোফাজ্জুল হক, সাবেক মেয়র, নবীগঞ্জ উপজেলা।
জনাব আলমগীর চৌধুরী, সাবেক নবীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান।
জনাব ফজলুল হক চৌধুরী সেলিম, সাবেক নবীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান।
জনাব ছাবির আহমদ চৌধুরী, মেয়র, নবীগঞ্জ উপজেলা।
জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরী সেফু, নবীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান।
জনাব সাইফুল জাহান চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান নবীগঞ্জ উপজেলা।
জনাব পারভেজ আলম, এ এসপি নবীগঞ্জ বাহুবল।
জনাব শাহরিয়ার আলম, ইউ এন ও, নবীগঞ্জ।

এবার যারা হাফেজ হলেন

হাফেজ আরশাদ আল মুমিন
পিতাঃ ইমদাদুল্লাহ আল মুমিন
পুরানগাঁও, ইমামবাড়ী
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭৭৮ ৫৪৯১৮০

হাফেজ আবু রায়হান
পিতাঃ জনাব উমর ফারুক
হুমাইপুর, বাজিতপুর
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
০১৭৫৩ ৩৫৮১৩৩

হাফেজ মহিদুল ইসলাম (জীবন)
পিতাঃ জনাব আব্দুল কাইয়ুম
বিরাট উজানপাড়া
আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭২২ ০৮৪০৮৮

হাফেজ হাবিবুর রহমান (মিছবাহ)
পিতাঃ জনাব মঈনুদ্দীন মিয়া
পাঞ্জারাই, সৈয়দগঞ্জ
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৩০১ ৯৫৭৯২৭

হাফেজ মোজাম্মিল হক (সুলাইমান)
পিতাঃ জনাব কাজল মিয়া
নন্দীপাড়া বড় বাজার
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৭৭৩ ১১০৫৫৫

হাফেজ পারভেজ আহমদ
পিতাঃ জনাব ইয়াকুব মিয়া
মুত্তাহার সৈয়দগঞ্জ
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭৩৫ ০৫২০৬৯

হাফেজ শাহরিয়ার কবির
পিতাঃ জনাব মহিবুর রহমান
বড়ইউড়ি, বড়বাজার
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৭৫৪ ২৫৯৪১৯

হাফেজ নাজিম উদ্দিন
পিতাঃ জনাব নূর উদ্দিন
রামগঞ্জ সিকন্দরপুর
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৭৮২ ৪৭৯৫৪৭

হাফেজ মোঃ সোহাগ আহমদ
পিতাঃ জনাব লোকমান মিয়া
বালুচর, আদমপুর
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ
০১৩১৯ ০৭৯২৯০

হাফেজ মোঃ হুসাইন আহমদ
পিতাঃ জনাব আঃ হাদী
গুমগুমিয়া, সৈয়দগঞ্জ
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৯১৪৭২৭৪১১

হাফেজ মাসুদুল হাসান (মামুন)
পিতাঃ জনাব নুরুল হক মিয়া
দৌলতপুর, কাদিরগঞ্জ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৭৬৫ ১২৩২৩৪

হাফেজ হাসান আহমদ
পিতাঃ জনাব আজিজুর রহমান
লতিফপুর, গোপলার বাজার
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭২০ ১৭২৭৬৪

হাফেজ সাজ্জাতনুর রহমান মুসা
পিতাঃ জনাব সালেহ আহমদ
রফি হরিপুর
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭৭৯ ৮৮০০৬৮

হাফেজ আব্দুর রহিম
পিতাঃ জনাব আব্দুল হান্নান
হলদারপুর, মান্দারকান্দি
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৭৫৩ ৪৬৯৯৪৭

হাফেজ আল-মামুন
পিতাঃ জনাব মফিকুল ইসলাম
দৌলতপুড়, কাদিরগঞ্জ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৭৭৩ ৩৮৫৮১০

হাফেজ আশিকুর রহমান
পিতাঃ জনাব আব্দুর রহিম
সিদ্দিকপুর, কালিয়ারভাঙ্গা
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭৭৬ ৭৫০৯৩৬

হাফেজ সজিবুর রহমান চৌধুরী
পিতাঃ ফয়জুল আহমদ চৌধুরী
পুরানগাঁও, ইমামবাড়ী
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭৮৬ ৩৮৬২৬৯

হাফেজ তোফায়েল আহমদ
পিতাঃ জনাব মোহাম্মদ আলী
চাঁনপাড়া, বড়বাজার
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ
০১৭৫১ ৬০০৮১৯

হাফেজ মোবাশ্বির আহমদ
পিতাঃ জনাব আশিক মিয়া
চারগাঁও, দৌলতপুর
বাহুবল, হবিগঞ্জ
০১৭৭৬ ০৮১৪৬৪

হাফেজ মাহফুজুর রহমান শুয়াইব
পিতাঃ জনাব মোহাম্মদ আলী
ইমামবাড়ি বাজার, কালিয়ারভাঙ্গা
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭২১৮০২৭৪২

হাফেজ সাদিকুর রহমান
পিতাঃ জনাব বিল্লাল মিয়া
আজিমনগর, আজমিরীগঞ্জ
হবিগঞ্জ
০১৯৬৫ ২৪১২০৪

হাফেজ মুজিবুর রহমান (সাঈদ)
পিতাঃ জনাব ফারুক মিয়া
নিজআগনা, কুড়ের পাড়
কাজিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭৬৬ ৮৭৬৭৮৭

হাফেজ ফয়জুল আহমদ
পিতাঃ জনাব হেলাল আহমদ
বেগমপুর সৈয়দগঞ্জ
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭৫৭৪৫৬৩৯০

হাফেজ মোস্তাকিম বিল্লাহ মারুফ
পিতাঃ জনাব মহাব্বত আলী
সুলতানপুর, বাংলাবাজার
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
০১৭৯৯ ৮৫৭২৪৫

মোহাম্মদিয়া টেইলার্স
এন্ড ক্লথ স্টোর
প্রোঃ হাজী আবু সুফিয়ান
01737-490975
উন্নত মানের দেশি বিদেশী শার্টিং স্যুটিং
প্যান্টিং ও পাঞ্জাবীর কাপড় বিক্রয় করা হয় ।
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মার্কেট
মধ্যবাজার নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ ।

ক্রিয়েটিভ ডিজাইন নিখুঁত প্রিন্টিং
আমাদের সেবা সমূহঃ
ডিজিটাল ব্যানার, ফেস্টুন
সাইন বোর্ড, স্টিকার, মার্বেল পাথর
নামাজের সময়সূচী, সিল, স্বরণিকা
পোস্টার, লিফলেট, ভিজিটিং কার্ড
ক্যালেন্ডার, ক্রেস্ট প্রিন্ট, মগ প্রিন্ট
আইডি কার্ড, বিয়ের কার্ড, গ্রাফিক্স
ডিজাইন সহ যাবতীয় ছাপা ও
স্ক্রীন প্রিন্টের কাজ করা হয় ।
Ad Corner
Graphics & Sign
OLY AHMED
Proprietor.
Ad Corner Graphic & Sign
+8801709 545 787
+8801719 022 361
facebook/ad corner
adcorner.nj@gmail.com
মগ প্রিন্ট

১৯৯১ থেকে
সৌরভ আর্ট
এন্ড ডিজিটাল প্রিন্ট সাইন
প্রোঃ হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সাবেক শিক্ষক,
আরমান উল্লাহ ইসলামিক একাডেমী এন্ড হাই স্কুল
01715 60 04 84
01785 05 56 10
shawrovart@gmail.com
ওসমানী রোড, উপজেলা সংলগ্ন নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ ।

ষান্মাসিক

ফারুক্বী পয়গাম
Faruqi Poygam

৩য় সংখ্যা । জিলহজ্ব ১৪৪৫ হিজরি । মে ২০২৪ ইংরেজি

জামেয়ার একাডেমিক ভবন

মসজিদে উমর ফারুক রা.

জামেয়ার প্রধান ফটক

জামেয়ার হিফজ বিভাগ

JAMIA FARUQIA TAJPUR NABIGANJ HABIGANJ
প্রতিষ্ঠাতা: শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুক্বী
E-mail : **Jamiafaruqia**@hotmail.com | **mataherfaruqi**@hotmail.com